# Ekjon Himu Koekti Jhin Jhin Poka by Humayun Ahmed

suman_ahm@yahoo.com

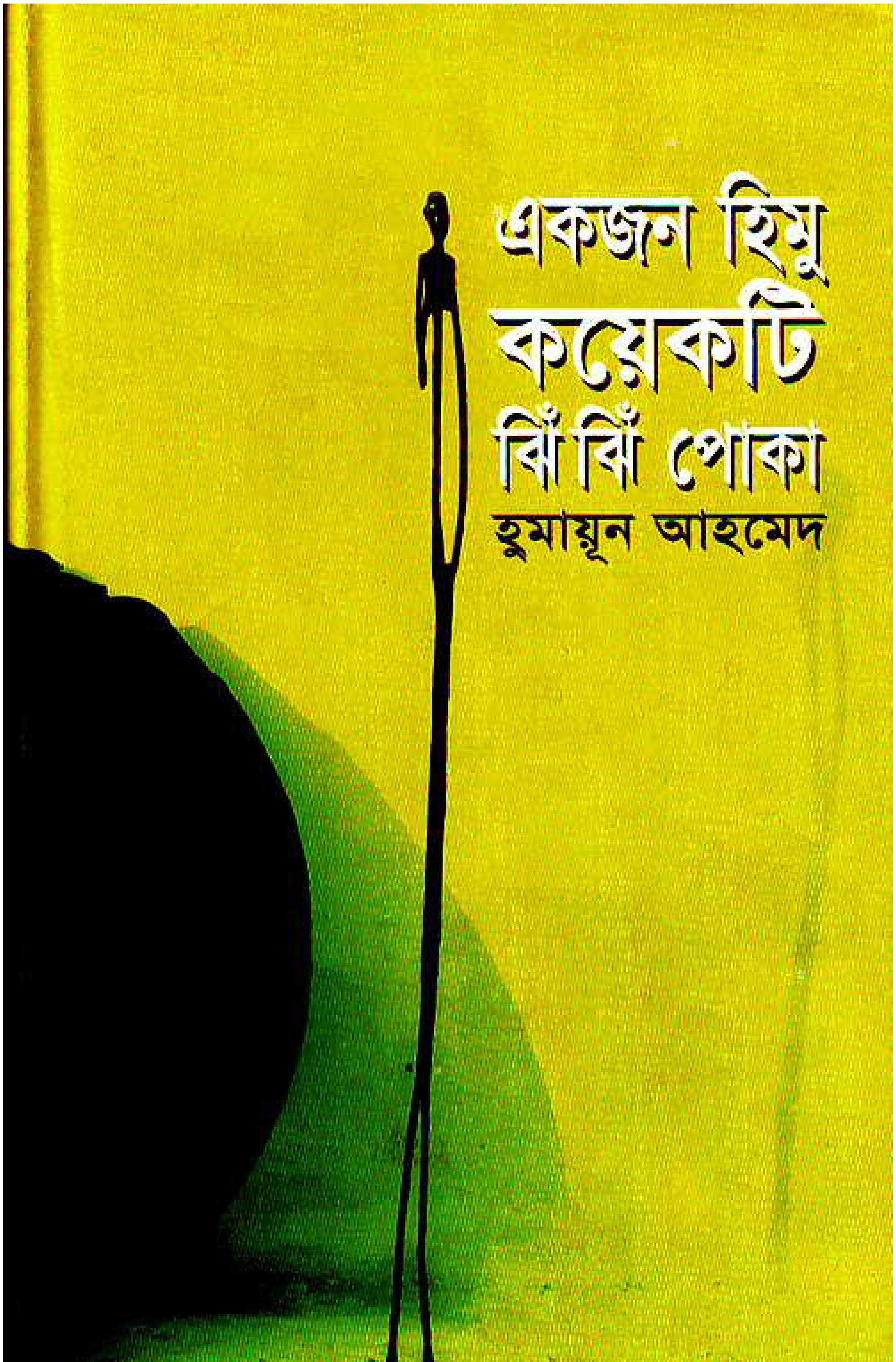
একজন হিমু
কয়েকটি
ঝিঁঝিঁ পোকা
হুমায়ূন আহমেদ

## ভূমিকা

হিমু কখনো জটিল পরিস্থিতিতে পড়ে না। ছোটখাট ঝামেলায় সে পড়ে। সেই সব ঝামেলা তাকে স্পর্শও করে না। সে অনেকটা হাঁসের মত। ঝাড়া দিল গা থেকে ঝামেলা পানির মত ঝরে পড়ল।

আমার খুব দেখার শখ বড় রকমের ঝামেলায় পড়লে সে কী করে। কাজেই হিমুর জন্যে বড় ধরনের একটা সমস্যা আমি তৈরি করেছি। এবং খুব আগ্রহ নিয়ে তার কাণ্ড-কারখানা দেখছি।

**হুমায়ূন আহমেদ**
নুহাশ পল্লী, গাজীপুর।

আমার চেহারায় খুব সম্ভবত 'I am at your Service' জাতীয় ব্যাপার আছে। আমি লক্ষ করেছি প্রায় সব বয়েসী মেয়েরা আমাকে দেখলেই টুকটাক কিছু কাজ করিয়ে নেয়। তার জন্যে সামান্য অস্বস্তিও বোধ করে না।

নিতান্ত অপরিচিত মহিলা নির্বিকার ভঙ্গিতে আমাকে বলবে—এই ছেলে, এই হলুদ পাঞ্জাবি, একটা রিকশা খুঁজে দাও তো। রিকশা না পেলে বেবিটেক্সি। মালীবাগ যাব। ভাড়া ঠিক করে এনো।

এই ধরনের কাজ আমি আগ্রহের সঙ্গে করি। দরদাম করে রিকশা ঠিক করি, জিনিসপত্র তুলে দেই। খট করে রিকশার হুড তুলি। এবং শেষপর্যায়ে প্রিয়জনদের উপদেশ দেবার মতো সামান্য উপদেশ দেই— 'শাড়ি টেনে বসুন। চাকার সঙ্গে পেঁচিয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ এইবার হয়েছে।'

শেষ উপদেশ রিকশাওয়ালাকে, রিকশা দেখেশুনে যাবে। No ঝাঁকুনি।

যার জন্যে এই কাজগুলি করা হয় তিনি খুব স্বাভাবিক থাকেন। আমার কর্মকাণ্ডে মোটেই বিস্মিত হন না। তিনি ধরেই নেন নিতান্ত অপরিচিত একজনের কাছ থেকে পাওয়া এই সেবা তাঁর প্রাপ্য। রিকশা চলতে শুরু করলে আমার দিকে তাকিয়ে ভদ্রতার হাসি কেউ কেউ দেন। বেশিরভাগই দেন না। উদাস হয়ে থাকেন।

রহস্যটা অবশ্যই চেহারায়। কারোর চেহারাই থাকে মিথ্যুকের মত। তারা নির্ভেজাল সত্যি কথা বললেও সবাই হাসে এবং মনে মনে বলে— "মায়ের কাছে খালাম্মার গল্প ? মিথ্যার ব্যবসা আর কত করবে ? এইবার ক্ষান্ত দাও না।"

suman_ahm@yahoo.com

আবার কারোর চেহারা হয় 'সত্যকে'র মত। যত বড় মিথ্যাই বলে মনে হয় সত্যি কথা বলছে।

কিছু চেহারা আছে চোর টাইপ। বেচারা হয়ত সাধু সন্ত মানুষ। স্কুলের অংক স্যার। শুধু চেহারার কারণে বাসে উঠলে বাসের অন্য যাত্রীরা চট করে পকেটে হাত দিয়ে মানিব্যাগ ঠিক আছে কি-না দেখে নেয়।

কসমেটিক সার্জারীতে চেহারা অদল-বদল করা হয় বলে শুনেছি। কসমেটিক সার্জনরা কি জানেন– মানুষের মুখের বিশেষ কোন জিনিসটির জন্যে সত্য ভাব, মিথ্যা ভাব, সাধু ভাব, চোর ভাব প্রকাশ পায় ? জানা থাকলে খুব সুবিধা হত। চোর চেহারার মানুষ ছোট্ট একটা অপারেশন করিয়ে সাধু হয়ে যেত।

এ ধরনের উচ্চশ্রেণীর চিন্তা আমি করছি ইস্টার্ন প্লাজা নামক এক বিশাল শপিং মলের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে। শপিং মলে ঢুকব কি-না ভাবছি। চলন্ত সিঁড়ি আছে। বিনা পয়সায় রেলগাড়ি চড়ার মত সিঁড়িগাড়ি চড়া। আগে মানুষ হাঁটতো সিঁড়ি দাঁড়িয়ে থাকত। এখন সিঁড়ি হাঁটে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে।

'Excuse me'—

অল্পবয়েসী মেয়ের ঝনঝনে গলা। নিশ্চয়ই সে আমাকে কিছু করতে বলবে।

আমি ঘাড় ফেরালাম। কে আমাকে ক্ষমা করতে বলছে তাকে দেখা দরকার।

ক্ষমাপ্রার্থী এই তরুণীর বয়স বাইশ তেইশ। সাজগোজ একেবারেই নেই। সাজগোজ না-করে ক্যাজুয়েল থাকাটা বর্তমানের ফ্যাশান। অনেককে দেখছি চুল ছেলেদের মতো ছোট ছোট করে কাটছে। কানে বিচিত্র ধরনের দুল পড়ছে।

| | | |
|---|---|---|
| মাটির দুল | ঃ | শান্তিনিকেতনী। শ্বাশত বাংলার মাটির গয়না উঠে এসেছে কানে। "ও আমার দেশের মাটি ......." |
| কাঠের দুল | ঃ | জাপানী বাবাজীরা বাঁশ, কাঠ কিছুই ফেলছে না। রং চং মাখিয়ে বাজারে ছেড়ে দিচ্ছে। |
| প্লাস্টিকের দুল | ঃ | ইউরোপীয়। প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ, তাম্র যুগের পর প্লাস্টিক যুগ। |



www.Murchona.com

লোহা লক্করের দুল : অবশ্যই আমেরিকান। আমেরিকানরা অন্য সবার মত করবে না। আলাদা কিছু করবে। কাজেই তারা বানাচ্ছে এক কানের দুল। একটা কান দুলের ভারে ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে। অন্য কান খালি।

কিছু কিছু দুল এমনই বিচিত্র যে মেয়ের মুখের দিকে তাকানো হয় না। দুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সময় চলে যায়। আমার এক মামাতো বোন (রেশমী, ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। সেকেন্ড ইয়ার ফলিত রসায়ন।) কানে যে দুল পরে তা ফুলের টবের মতো। সেই টবে সবুজ পাতাওয়ালা গাছ আছে। একটা গাছে আবার পিচকি পিচকি নীল ফুল ফুটে আছে। আমি বললাম, রেশমী তোর এই টবে কি নিয়মিত পানি দিতে হয়? রেশমী বিরক্ত হয়ে বলল, পানি দিতে হবে কেন ? এটা রিয়েল প্ল্যান্ট না, ইমিটেশন।

যে মেয়েটি মধুক্ষরা কণ্ঠে excuse me বলেছে তার কানে কোনো দুল নেই। সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে। শাড়ি পরে বোধ হয় অভ্যাস নেই। নানান জায়গায় সেফটিপিন দেখা যাচ্ছে। গোলগাল মুখ। চোখে চশমা। চশমার ফ্রেম রুপালি। আমার মনে হল— রুপালি না হয়ে সোনালি ফ্রেমের চশমা হলে খুব মানাত। এই মেয়ের মুখ তৈরিই হয়েছে সোনালি ফ্রেমের জন্যে।

'আপনি কি আমার একটা উপকার করতে পারবেন ?'

আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললাম, অবশ্যই পারব। একটা না, দু'টা উপকার করব। একটা নরম্যাল উপকার। আরেকটা ফাউ।

মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে ফেলল। এই সময়ের মেয়েদের চরিত্রে দ্বৈত ভাব অত্যন্ত প্রবল। তারা পত্রিকায় ইন্টারভ্যু দেবার সময় বলবে— যে সব পুরুষের রসবোধ আছে, যারা কথায় কথায় রসিকতা করে তাদেরকেই তারা পছন্দ করে। সেইসব পুরুষ তাদের স্বপ্নের পুরুষ। বাস্তবে কোনো ছেলে রসিকতা করে কোনো মেয়েকে কিছু বললে সেই মেয়ে ভুরু কুঁচকাবেই। রসিকতা যত নির্মলই হোক, সেই মেয়ে রসিকতায় কলঙ্ক খুঁজে পাবে এবং মনে মনে বলবে— গোপাল ভাঁড় কোথাকার। সব সময় ফাজলামী।

মেয়েটি বলল, আমি অনেকক্ষণ হল রাস্তা ক্রস করার চেষ্টা করছি, পারছি না। অন্যদিন ট্রাফিক পুলিশ থাকে। আজ ট্রাফিক পুলিশও নেই। আপনি কি রাস্তা ক্রস করার ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য করবেন ?

আমি 'দেখি কী করা যায়' বলেই ঝাঁপ দিয়ে দু'হাত উঁচু করে রাস্তার মাঝখানে পড়ে গেলাম। সেইসঙ্গে বিকট চিৎকার— 'ট্রাফিক বন্ধ, ট্রাফিক বন্ধ। চাক্কা ঘুরবে না।'

নিমিষের মধ্যে ব্রেক কষে সব গাড়ি থেমে গেল। রিকশাওয়ালারা দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ির ড্রাইভাররা মুখ বের করে আতঙ্কিত ভঙ্গিতে দেখতে চেষ্টা করল কী হচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে টোকাইরা খুব মজা পায়। তারাও লাফ দিয়ে রাস্তায় নামল। এবং আমার মতোই হাত উঁচু করে গাড়ি আটকাতে লাগল। একজন অতি উৎসাহী ছুটে গিয়ে পর পর দু'টা রিকশার 'পাম' ছেড়ে দিল। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চোখে ইশারা করলাম রাস্তা পার হতে। সে রাস্তা পার হল।

ইতিমধ্যে রাস্তায় জট পাকিয়ে গেছে। একটা গাড়ির ড্রাইভার ভয় পেয়ে গাড়ি উল্টোদিকে নেবার চেষ্টা করতে গিয়ে পুরোপুরি গিট্টু পাকিয়ে ফেলেছে। এই গিট্টু আপনা-আপনি খুলবে না। গিট্টু খুলতে এক্সপার্ট ট্রাফিক সার্জেন্ট লাগবে। সে এসে বেশ কিছু রিকশাওয়ালাকে মারধোর করবে– তারপর যদি কিছু হয়।

আমি তরুণীকে বললাম, আর কোনো সাহায্য লাগবে ? আমি ধরেই নিয়েছিলাম মেয়েটি না-সূচক মাথা নাড়বে। সামান্য রাস্তা পার করাতে যে এত যন্ত্রণা করে তার ওপর ভরসা করা যায় না।

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আরেকটু ফাউ সাহায্য করতে পারেন। আমাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারেন। একটা লোক আমাকে ফলো করছে। আমার ভালো লাগছে না।

'কে ফলো করছে ?'

'গলায় হলুদ মাফলারওয়ালা একটা লোক। আমি যখন ইস্টার্ন প্লাজায় ছিলাম তখনো আমার পেছনে পেছনে ঘুরেছে। এখনো দেখি পেছনে পেছনে আসছে।'

'প্যাঁচ লাগিয়ে দেব ?'

'প্যাচ লাগাতে হবে না। দয়া করে আমার পেছনে পেছনে এলেই হবে।'

আমি নিতান্ত অনুগতের মতো তার পেছনে পেছনে যাচ্ছি। মেয়েটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, 'ভালো কথা আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না কেন?'

আমি হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, চিনতে পারার কথা ?

'অবশ্যই। আমি সীমার বান্ধবী।'

'সীমাটা কে ?'

'সীমাটা কে মানে ? সীমা আপনার মামাতো বোন। গত মাসে বিয়ে করেছে। কোর্টে গিয়ে গোপন বিয়ে। আপনি সেই বিয়েতে সাক্ষী ছিলেন।'

'ও হ্যাঁ। মনে পড়েছে। তুমিও ছিলে সেই বিয়েতে ?'

'হ্যাঁ ছিলাম। এবং আপনি সেদিন আমার সঙ্গে অনেক গল্প করেছিলেন।'

'ও আচ্ছা।'

'সেদিন আমি সোনালি ফ্রেমের চশমা পরেছিলাম। আপনি বলেছিলেন, রুপালি ফ্রেমের চশমা হলে আমাকে খুব মানাত। আমার মুখটা না-কি তৈরিই হয়েছে রুপালি ফ্রেমের জন্যে। আমি আপনার কথামতো রুপালি ফ্রেম কিনেছি।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনি আমাকে না চিনেই লাফালাফি করে গাড়ি থামালেন। আশ্চর্য তো। অন্য কোনো মেয়ে যদি আপনাকে রাস্তা পার করাতে বলত আপনি কি এরকম লাফালাফি করতেন ?'

'বুঝতে পারছি না।'

'আমার মনে হয় করতেন। আমার নাম কি আপনার মনে আছে ?'

'অবশ্যই মনে আছে। তবে মনে থাকলেও মন থেকে টেনে মুখে আনতে একটু সমস্যা হচ্ছে। ফুলের নামে নাম। হয়েছে ?'

'বলুন কী ফুল ?'

'প্রচুর গন্ধ আছে এমন একটা ফুল। রাতে ফোটে। মনে পড়েছে তোমার নাম জুঁই।'

'কিছুই হয়নি। আমার নাম আঁখি।'

'ও আচ্ছা, আঁখি।'

মেয়েটি তার গাড়ি খুঁজে পেয়েছে। কালো রঙের বিশাল এক গাড়ি। গাড়ির মতো গাড়ির ড্রাইভারও বিশাল। ড্রাইভার সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে দেখে ভালো লাগল। মানুষের সন্দেহের দৃষ্টিতে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে কেউ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকালে ধাক্কার মতো লাগে। সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালে মনে হয় সব ঠিক আছে।

আঁখি বরফ শীতল গলায় বলল, গাড়িতে উঠুন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আমাকে গাড়িতে উঠতে বলছ!

'হ্যাঁ।'

'কেন বলো তো?'

'আগে গাড়িতে উঠুন। তারপর বলছি।'

আমি গাড়িতে উঠে পড়লাম। আঁখি বলল, সহজে আমার মন খারাপ হয় না। আপনি আমাকে চিনতে পারেননি এইজন্যে মন খারাপ লাগছে। যে মেয়ে আপনার সামান্য কথায় চশমার ফ্রেম বদলে ফেলে আপনি তাকে চিনবেন না, এটা কেমন কথা?

বিশালদেহী ড্রাইভার গাড়ির ব্যাক ভিউ মিরার নাড়াল। আমি এখন সেই আয়নায় ড্রাইভারের মুখ দেখতে পাচ্ছি। কাজেই সেও নিশ্চয়ই আমাকে দেখছে। ড্রাইভার কাজটা করেছে আমাকে চোখে-চোখে রাখার জন্যে। গাড়ি চলতে শুরু করল।

আঁখি বলল, দয়া করে পেছনে ফিরে দেখুন তো লাল রঙের কোনো গাড়ি আমাদের ফলো করছে কি-না।

আমি বললাম, না।

'এখন না করলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন ঐ গাড়ি আমাদের পেছনে চলে এসেছে। জানা কথা আসবে।'

আমি পেছন দিকে তাকিয়ে আছি। আঁখি বলল, এই ভাবে পেছন দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হবে না। গাড়ি আসুক পেছনে-পেছনে। আপনি সোজা হয়ে বসুন।

আমি সোজা হয়ে বসলাম।

'আমার সঙ্গে গাড়িতে যেতে আপনার কি অস্বস্তি লাগছে?'

'না।'

'তাহলে চুপ করে আছেন কেন, গল্প করুন।'

'গল্প তো জানি না।'

'কথা বলুন।'

'কথাও জানি না।'

'আমার বান্ধবীর বিয়ের দিন মজার মজার কথা বলছিলেন। আমি এমন সমস্যায় পড়েছিলাম, হাসতেও পারছিলাম না। আবার না-হেসেও থাকতে পারছিলাম না।'

'হাসতে পারছিলে না কেন?'

'শীতের সময় তো, এইজন্যে হাসতে পারিনি।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, শীতের সময় হাসা যায় না?

আঁখি বলল, অন্য সবাই হাসতে পারে। আমি পারি না। আমার গায়ের চামড়া খুব খারাপ। শীতের সময় ঠোঁট ফাটে। ঠোঁট ফাটা অবস্থায় হাসার চেষ্টা করে দেখবেন তাহলে আমার সমস্যাটা বুঝবেন।

'তোমার উচিত এমন কোনো ছেলেকে বিয়ে করা যে কখনো তোমাকে হাসাবার চেষ্টা করবে না। রামগরুড় ছানা টাইপ।'

আঁখি হেসে ফেলল।

আমি মাথা ঘুরিয়ে আঁখির দিকে তাকালাম। মেয়েটার হাসি ভালো করে লক্ষ করতে হবে। 'হাসি' নিয়ে আমার বাবার উপদেশবাণী আছে।

> হাস্যমুখি মানুষের দিকে ভালোমতো তাকাইও। অনেক কিছু শিখিতে পারিবে। মানুষের মনের ভাব কখনই মুখে প্রতিফলিত হয় না। মুখের উপর সর্বদা পর্দা থাকে। শুধু মানুষ যখন হাসে তখন পর্দা দূরিভূত হয়। হাস্যরত একজন মানুষের মুখে তার মনের ছায়া দেখা যায়।

আঁখি ভুরু কুঁচকে বলল, আপনি এ ভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?

'তোমার হাসি দেখছি।'

'আমি তো ভালোমতো হাসিনি। হাসি দেখবেন কী? ঐ দিনের মত মজার মজার কথা বলুন। আমি খিলখিল করে হাসব। আপনি ভালোমতো হাসি দেখতে পাবেন। ইচ্ছা করলে আমার হাসি ক্যাসেটে রেকর্ড করেও নিয়ে যেতে পারেন। আচ্ছা শুনুন আপনার একটা হাসির গল্প আমি

অনেকের সঙ্গে করেছি। কাউকে হাসাতে পারিনি। মনে হয় আপনি যেভাবে গল্পটা করেছেন আমি সেভাবে করতে পারিনি। কাইন্ডলি গল্পটা আরেকবার বলুন তো।'

'কোন গল্পটা ?'

'ঐ যে একজনকে জিজ্ঞেস করল তুমি কোন ক্লাসে পড়ো ? সে বলল ক্লাস এইট, সেকেন্ড ইয়ার। তখন প্রশ্নকর্তা বলল, ক্লাস এইট, সেকেন্ড ইয়ার মানে কী ? সে বলল, ক্লাস এইটে এক বছর ফেল করেছি। এইজন্যে সেকেণ্ড ইয়ার।'

আঁখি গল্প শেষ করে মহানন্দে হাসতে লাগল। হাস্যমুখী মানুষের মুখ থেকে পর্দা সরে যাবার কথা। মেয়েটির মুখ থেকে পর্দা সরছে না। আমি তার মুখে মনের কোনো ছায়া দেখতে পারছি না। বরং মনে হচ্ছে নিজেকে সে খুব ভালভাবে আড়াল করে রেখেছে।

গাড়ি আলিয়াস ফ্রাসিঁসে থামল। আঁখি বলল, আমি এইখানে নামব। ফটোগ্রাফির উপর একটা কোর্স নিচ্ছি। আপনি কোথায় যেতে চান ড্রাইভারকে বললেই সে নিয়ে যাবে। আর আপনি যদি আমার সঙ্গে কফি খেতে চান তাহলে ঘন্টাখানিক গাড়িতে বসে থাকতে হবে। ক্লাস শেষ করে এক ঘন্টার মধ্যে ফিরব। আমার বান্ধবীর বিয়ের দিন আপনাকে আমার সঙ্গে কফি খেতে বলেছিলাম। আপনি বলেছিলেন কোনো একদিন খাবেন। আমি বলেছিলাম, কোনো একদিনটা কবে ? আপনি বলেছিলেন আবার যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে সেদিনই হবে— কোনো একদিন।

'তুমি ফটোগ্রাফি শিখে এসো। আমি অপেক্ষা করি।'

'আপনি গাড়িতে বসে গান শুনতে পারেন। গাড়ির গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে ভিডিও গেম আছে। ইচ্ছা করলে ভিডিও গেম খেলতে পারেন।'

'দেখি কী করা যায়।'

আমি গাড়ি থেকে নেমে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক হাঁটলাম। গাড়ির ড্রাইভার তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার প্রতি তার সন্দেহ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে। আমি রাস্তা পার হলাম। চায়ের দোকান দেখা যাচ্ছে। চা খেতে-খেতে চাওয়ালার সঙ্গে গল্প করলেও কিছু সময় কাটবে। আরেকটা বড় সুবিধা হচ্ছে চায়ের দোকানটা এমন জায়গায় যে আঁখির ড্রাইভার গাড়িতে বসে আমাকে দেখতে পাবে না।

চায়ের কাপে প্রথম চুমুকটি দিয়েছি, দ্বিতীয় চুমুক দিতে যাচ্ছি এমন সময় আমার কাঁধে কে যেন হাত রাখল। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখি হলুদ মাফলার গলায় এক লোক। তার সামান্য গোঁফ আছে। হিটলার সাহেবের বাটার ফ্লাই গোঁফ। যা হিটলার ছাড়া আর কাউকেই মানায় না।

রাস্তার পাশে লাল রঙের একটা গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়াও আরো দু'জন বসে আছে। তারাও কঠিন দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে।

গলায় মাফলারওয়ালা বলল, আপনি কি একটু আসবেন ?

আমি হাসিমুখে বললাম, চা খাচ্ছি তো।

'আচ্ছা ঠিক আছে। চা-টা দ্রুত শেষ করুন। আমি অপেক্ষা করছি।'

আমি বললাম, আপনিও এক কাপ খান। আমি দাম দিচ্ছি। মাফলার ওয়ালা এমন ভাবে তাকাল যেন এমন অদ্ভুত নিমন্ত্রণ এর আগে সে পায়নি। আমি বললাম, আমাকে আপনার দরকারটা কী জন্যে ? মাফলারওয়ালা জবাব দিল না। লালগাড়ির ভেতর যে দু'জন বসেছিল তাদের একজন নেমে এল। রোদে পোড়া চেহারা। তার পান খাওয়ার অভ্যাস আছে। দাঁত লাল হয়ে আছে।

আমি ধীরে-সুস্থে চা খাচ্ছি। চা-টা খেতে ভাল হয়েছে। আরেক কাপ খেতে পারলে ভাল হত। মাফলারওয়ালা সেই সুযোগ দেবে বলে মনে হয় না। আমি মাফলারওয়ালার দিকে তাকিয়ে বললাম, ব্যাপারটা কি জানতে পারি ?

মাফলারওয়ালা বলল, আপনার ভয়ের কিছু নেই আমরা পুলিশের লোক। আই বি-র।

পুলিশের লোক শুনে আমি আশ্বস্তবোধ করছি, এমনভাব করে বললাম, আমি ভয়ংকর কেউ এরকম কোনো রিপোর্ট কি আপনাদের কাছে আছে ?

মাফলারওয়ালা জবাব দিল না। আমি বললাম, আমার নাম কি আপনারা জানেন ?

'জানি না।'

'আমি কি কোনো অপরাধ করেছি যে বিষয়ে আমি নিজে কিছু জানি না ?'

'আপনার চা খাওয়া শেষ হয়েছে। এখন উঠুন।'

'দু'টা মিনিট সময় দিন। আঁখির ড্রাইভারকে খবর দিয়ে যাই।'

'কাউকে কোনো খবর দিতে হবে না।'

'ও দুঃশ্চিন্তা করবে ।'

মাফলারওয়ালা আমার হাত চেপে ধরল। যাকে বলে বজ্র মুষ্ঠি। আমি সুবোধ বালকের মত তার সঙ্গে লাল গাড়িতে উঠলাম। প্রেমিকার ধরা হাতও ছাড়িয়ে নেয়া যায়। পুলিশেরটা যায় না।

পুলিশের খুব বড় অফিসারদের আমি কাছাকাছি থেকে আগে দেখিনি। আমার দৌড় রাস্তার ট্রাফিক সার্জেন্ট, থানার সেকেন্ড অফিসার বা ওসি সাহেব পর্যন্ত। এই প্রথম পুলিশের একেবারে উপরের দিকের কাউকে দেখছি। কী আশ্চর্য কলেজের সিনিয়ার প্রফেসরদের মত চেহারা। মুখে হাসি। পরেছেন ফিনফিনে পাঞ্জাবি পায়জামা। গলার স্বর মোলায়েম। দেখে মনেই হয় না এই ভদ্রলোক কাউকে জীবনে ধমক ধামক করেছেন কিংবা বুট দিয়ে লাথি মেরেছেন। এই ভদ্রলোকের পা নিশ্চয়ই ছোট ছোট। সেই মাপের বুট তৈরি না হবারই কথা।

ঘরের সাজ সজ্জাও চমৎকার। কার্পেট বিছানো ঘর। অফিসের কার্পেটের মত নোংরা রঙজ্বলা কার্পেট না। মনে হচ্ছে এই মাসেই কেনা হয়েছে। দেয়ালে আধুনিক দেয়াল ঘড়ি এবং ঘড়ি বন্ধ হয়ে নেই ঠিক টাইম দিচ্ছে। অফিস ঘরের এসিতে সব সময় ঘড়ঘড় শব্দ হয়। অফিস ঘরের এসি মানেই ব্রংকাইটিসের রুগী। অথচ এই ঘরে আছে শব্দহীন এসি। আমাকে কফি দেয়া হয়েছে। সেই কফির মগে ময়লা জমে নেই এবং কফিটা গরম। খেতে বেশ ভাল।

'আপনার নাম ?'

'হিমু!'

'ভাল নাম বলুন। ডাকনামটা বাবা-মা এবং বন্ধুবান্ধবের জন্যে তোলা থাকুক।'

'ভাল নাম হিমালয়।'

'কফিটা কি খেতে ভাল হয়েছে ?'

'জ্বি ভাল হয়েছে।'

'ভাল হবার কথা না। আমার কফি বানায় ইদরিস নামের একজন সে আজ আসেনি। কোনো এক দিন হয়তোবা ইদরিসের বানানো কফি আপনাকে খাওয়াতে পারব।'

'স্যার আমাকে কি জন্যে এখানে আনা হয়েছে বললে টেনশানটা কমে।'

'টেনশান বোধ করছেন ?'

'সত্যি কথা বলব ?'

'পুলিশের সামনে সত্যি কথা বলা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার তারপরেও সত্য বলতে চাইলে বলুন।'

'টেনশান বোধ করছি না।'

ভদ্রলোক চেয়ারে হেলান দিলেন। তাঁর সামনে রাখা টিস্যু বক্সে হাত দিয়ে টিস্যু বের করলেন। মুখ মুছে টিস্যু ফেললেন তাঁর পায়ের কাছে রাখা বেতের ঝুড়িতে। কিছুক্ষণ পর পর টিস্যু দিয়ে মুখ মোছা মনে হয় এই পুলিশ সাহেবের অভ্যাস। আমার সামনেই তিনি তিনবার মুখ মুছলেন।

'আপনি তা হলে টেনশান বোধ করছেন না!'

'জ্বি না।'

'পুলিশ যে কোনো মানুষের সামনে এসে দাঁড়ালেই সে টেনশান বোধ করে। সেখানে আপনাকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে তারপরেও টেনশান বোধ করছেন না ?'

'জ্বি না।'

'কারণ কি এই যে আপনার ধারণা আপনি কোনো অপরাধ করেননি কাজেই টেনশান বোধ করার কিছু নেই।'

'এটা কারণ না।' আমি ঢোঁক গিলতে গিলতে বললাম, পুলিশ যাদের ধরে নিয়ে আসে তাদের বেশ বড় অংশই কোনো অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। তাদেরই টেনশন বেশি।

'কেন ?'

'কারণ তারা চেষ্টা করে তাদের নিরপরাধ প্রমাণ করতে। এই চেষ্টা করতে গিয়ে সব কিছু আরো জট পাকিয়ে ফেলে। অপরাধী পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পায় নিরপরাধী সাধারণত পায় না।'

'আপনার কি ধারণা আপনি অপরাধী না নিরপরাধী ?'

'নিরপরাধী।'

'তা হলে তো আপনার ভীত হওয়া উচিত। ভীত হচ্ছেন না কেন?'

'থানা হাজতে আমার অভ্যাস আছে।'

'বাহ্ ভাল তো।' আপনার কনভিকশান হয়েছে? না-কি আপনার দৌড় হাজত পর্যন্ত?'

'এখনো কনভিকশান হয়নি।'

'একটা অভিজ্ঞতা তা হলে বাকি থেকে গেল। এটা কি ঠিক হচ্ছে?'

ভদ্রলোক হাসি মুখে প্রশ্ন করে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে এলেন। এই প্রথম তাঁকে 'পুলিশ' বলে মনে হচ্ছে।

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি স্যার।'

'আপনার ভয় পাবার কিছু নেই।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'জুঁই নামের কোনো মেয়েকে আপনি চেনেন?'

'জ্বি না।'

'বড় কালো রঙের গাড়িতে করে যে মেয়েটির সঙ্গে যাচ্ছিলেন তাঁকে চেনেন না?'

'ওর নাম জুঁই?'

'হ্যাঁ জুঁই।'

'জুঁইকে সামান্য চিনি।'

'তাঁর বাবাকে চেনেন?'

'জ্বি-না।'

'আমি জুঁই-এর বাবা।'

ভদ্রলোক আবারো মিষ্টি করে হাসলেন। আমিও হাসলাম। হাত বাড়িয়ে টিস্যু পেপার নিয়ে মুখ ঘসলেন। এই কাজটা আমার করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কাউকে বিরক্ত করার সবচে সহজ পথ হচ্ছে তাকে অনুকরণ করা। সে হাসলে হাসা। সে ভুরু বাঁকালে ভুরু বাঁকানো, সে কাশলে কাশা। ভদ্রলোক থানার সেকেন্ড অফিসার হলে হাত বাড়িয়ে বক্স থেকে টিস্যু পেপার নিয়ে মুখ ঘসতাম। এনার সঙ্গে করা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক চট করে

হাসি বন্ধ করে গম্ভীর হয়ে গেলেন। পুলিশের লোকরা এই কাজটা খুব ভাল পারে। এই মেঘ এই রোদ্র। এই চাঁদের আলো, এই বজ্রপাত।

'হিমু!'

আমি সামান্য চমকালাম, ভদ্রলোক এতক্ষণ হিমু সাহেব বলছিলেন। এখন সাহেব বাদ পড়েছে। আমি বিনীতভাবে বললাম, ইয়েস স্যার।

'আমার এই মেয়েটাকে নিয়ে আমি খুব সমস্যায় পড়েছি। সে আমার সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলছে। চার পাঁচ মাস ধরে সে সবাইকে লুকিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। দুই থেকে তিন ঘন্টা কাটিয়ে সহজ ভাবে ফিরে আসছে। উদাহরণ দেই। সে গাড়ি নিয়ে ইস্টার্ন প্লাজায় যাবে। গাড়ি দূরে কোথাও রেখে ইস্টার্ন প্লাজায় ঢুকবে। তারপর সে উধাও। ঘন্টা দু'এক পর খুব স্বাভাবিক ভাবে বের হবে। এই দু'ঘন্টা সে কিন্তু শপিং করছিল না। অন্য কোথাও ছিল। এরকম সে প্রায়ই করছে। আমি অনেক চেস্টা করেও ব্যাপারটা ধরতে পারছি না। তুমি কি জান সে কোথায় যায়!'

ব্যারোমিটারের কাঁটা দ্রুত নামছে। আগে ছিলাম আপনি। এখন হয়েছি তুমি। এই তুমি আন্তরিকতার তুমি না। অন্য তুমি। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আমি মোটামুটি করুণ মুখ করে বললাম, স্যার আমি জানি না।

'তুমি কি জেনে দিতে পারবে?'

'আমি জানতে পারব কিন্তু আপনাকে জানাব কি-না তা বলতে পারছি না।'

ভদ্রলোক আবারো টিস্যু বক্স থেকে টিস্যু নিলেন। মুখ ঘসতে-ঘসতে বললেন, তুমি জানবে এবং আমাকে জানাবে। তোমার সঙ্গে আমার কথা শেষ। এখন বিদেয় হও। একটা ব্যাপার তোমাকে বলে দিচ্ছি এখন থেকে আমার মেয়ের পেছনে না, তোমার পেছনে আমি লোক লাগিয়ে রাখব। বাঘের পেছনে যেমন ফেউ থাকে। তোমার পেছনেও ফেউ থাকবে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। তুমি আমার ভদ্র কথাবার্তা, এবং হাসি মুখ দেখে বিভ্রান্ত হোয়ো না। তুমি কি আমার বাসার ঠিকানা জান?'

'জ্বি না।'

'জুঁই তোমাকে কখনো বাসায় চা খেতে বলেনি?'

'বলেছে।'

'তুমি যাওনি ?'

'জ্বি না।'

'এখন যাবে। চা খেতে যাবে। গল্প করতে যাবে। এবং অতি অবশ্যই আসল খবরটা জুঁই-এর কাছ থেকে বের করবে। নাও এই কার্ডটা রাখ। এখানে আমার বাসার ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বার আছে।'

'স্যার এক গ্লাস পানি খাব।'

ভদ্রলোক বেল টিপলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজন পানির গ্লাস নিয়ে ঢুকল। পানির কথা বলতে হল না। এটা কি ভাবে সম্ভব হল বুঝতে পারলাম না। বেল টেপার মধ্যেই কি কোনো সংকেত আছে। এই ধরনের বেল মানে চা, এই টাইপ বেল হল– পানি। আরেক ধরনের বেলের অর্থ সামনে যে বসে আছে তাকে ধরে মার লাগাও।

'পানি খাব না স্যার।'

ভদ্রলোক শীতল চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি কাচুমাচু মুখ করে বললাম, পুলিশ অফিসগুলিতে পানি খাওয়া ঠিক না। এদের পানির ট্যাংকে ডেডবডি থাকে। পত্রিকায় পড়েছি।

'আই সি। তা হলে পানি না খাওয়াই ভাল।'

আমি বের হয়ে এলাম এবং মোটামুটি নিশ্চিত ভাবে জেনে গেলাম আমি শক্ত পাল্লায় পড়েছি। ইনি সহজ পাত্র না।

২

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে কেউ যদি দেখে তার পাশে এমন একজন লোক বসে আছে যার চেহারা তক্ষকের মত, এবং সে ক্রমাগত মুখ নাড়ছে কিন্তু মুখ থেকে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না তখন কী করা উচিত ? লাফ দিয়ে উঠে বসে—"কে কে" বলে চিৎকার করা উচিত, না-কি প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলাবার জন্যে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলা উচিত ?

আমি লাফ দিয়ে উঠে না বসে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিবেচনা করা যাক। ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করলে হয়ত দেখা যাবে ব্যাপারটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। জগতের অতি স্বাভাবিক ঘটনাগুলিও শুধু পরিস্থিতির কারণে অস্বাভাবিক মনে হয়।

যেহেতু আমার ঘরের দরজা সব সময় খোলা থাকে সেহেতু যে কেউ আমার ঘরে ঢুকতে পারে।

লোকটা চেয়ারে না বসে আমার গা ঘেসে বিছানায় বসে আছে। এরও যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে। আমার চেয়ারের একটা পা নড়বড়ে। সে হয়ত চেয়ারে বসতে গিয়ে ভরসা না পেয়ে আমার বিছানায় বসেছে।

লোকটার চেহারা 'তক্ষকের' মত। এটা খুবই অস্বাভাবিক ধারণা। তক্ষক সরিসৃপ জাতীয় প্রাণী। মানুষ হোমোসেপিয়ান– তার চেহারা তক্ষকের মত হতে পারে না। লোকটার চোখ দু'টা হয়ত বড় বড় এবং দু'টা চোখই অক্ষিগোলক থেকে সামান্য বের হয়ে আছে। এ রকম প্রায়ই দেখা যায়। থাইরয়েড গঠিত সমস্যায় এরকম হয়, চোখ কোটর থেকে খানিকটা বের হয়ে থাকে। ভদ্রলোকেরও তাই হয়েছে। সে কারণেই তাকে হয়তোবা খানিকটা তক্ষক বা টিকটিকির মত লাগছে।

বাকি থাকল মুখ নাড়ানো। মুখ নাড়ছে ঠোঁট নাড়ছে, শব্দ হচ্ছে না। অনেক সময়ই মানুষের মুখ নড়ে, ঠোঁট নড়ে, শব্দ হয় না। যেমন পান খাবার সময়, চুইং গাম চিবানোর সময়। লোকটা নিশ্চয়ই পান খাচ্ছে কিংবা

চুইং গাম চিবুচ্ছে। পুরো ব্যাপারটায় সাধারণ ব্যাখ্যা আছে। কাজেই সহজ ভাবে আমি চোখ মেলতে পারি এবং উঠে বসতে বসতে বলতে পারি– "ভাই কেমন আছেন ? আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না। কোথায় দেখেছি বলুন তো ?"

এই প্রশ্নের উত্তরে তক্ষক-ভদ্রলোক হয়ত বলবেন, আপনি আমাকে আগে কখনো দেখেননি। আমি পুলিশের লোক। জুঁই-এর বাবা আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনার উপর সারাক্ষণ লক্ষ রাখার কথা তো– এই জন্যেই বসে আছি। লক্ষ রাখছি। ভাল আছেন ?

আমি উঠে বসলাম। চোখ মেললাম, কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক বললেন, আপনি কি হিমু ? ভদ্রলোকের গলার স্বর অ্যান্টার্কটিকার বাতাসের মতই শীতল। এমন শীতল কণ্ঠস্বর সচরাচর শোনা যায় না। ভদ্রলোক এই ঘরে বসে দশ মিনিট বক্তৃতা দিলে ঘরের তাপ দশ ডিগ্রী কমে যাবার কথা।

'আপনার নাম হিমু ?'

'জ্বি আমার নাম হিমু।'

'আপনি মালিহা বেগম নামে কাউকে চেনেন ?'

'জ্বি না। চিনি না।'

'ভাল করে চিন্তা করে বলুন।'

'ভাল করে চিন্তা করেই বলছি, এই নামে কাউকে চিনি না।'

'উনি আমেরিকায় থাকেন সম্পর্কে আপনার খালা হন। দূর সম্পর্কের খালা।'

'ও আচ্ছা মালু খালা। ওনারা দুই বোন, একজনের নাম মালিহা, তাঁকে ডাকতাম মালু খালা। আরেক জনের নাম সালেহা। তাঁকে ডাকতাম সালু খালা। সালু খালার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই তবে মালু খালার সঙ্গে আছে। উনি প্রতি নিউ ইয়ার্সে একটা কার্ড পাঠান। শুধু কার্ড না, কার্ডের সঙ্গে ডলার থাকে। মালিহা খালার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী ?'

'কোনো সম্পর্ক নাই। ঢাকায় ওনার যে বিষয় সম্পত্তি আছে তা দেখ ভাল করি। আমি কি আপনার ঘরে একটা সিগারেট খেতে পারি ?'

'অবশ্যই পারেন।'

'আমার নাম হাদি।'

'কী নাম বললেন, হাদি ?'

'জ্বি হাদি। সৈয়দ হাদিউজ্জামান খান।'

'ও আচ্ছা। নাম তো খুবই জবরদস্ত।'

হাদি সাহেব সিগারেট ধরালেন। ভদ্রলোককে এখনো তক্ষকের মতই লাগছে। তাঁর চোখ ঠিক আছে, মুখের শেপের কোনো সমস্যার জন্যেই বোধ হয় তক্ষক ভাব এসেছে। সমস্যাটা আমি ধরতে পারছি না। ভদ্রলোক পান বা চুইং গাম কিছুই খাচ্ছেন না। মাঝে মধ্যে মুখ নাড়ানো সম্ভবত ওনার অভ্যাস। ভদ্রলোকের চেহারা যেমনই হোক– তিনি পুলিশের লোক না এটা ভেবেই শান্তি শান্তি লাগছে। পুলিশের চেয়ে তক্ষক ভাল।

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি।'

'আপনার মালিহা খালা সামারের ছুটি কাটাতে দেশে এসেছেন। দুই মাস থাকবেন। আপনার সঙ্গে যোগাযোগের অনেক চেষ্টা করেছেন।'

'ও।'

'চেষ্টা উনি করেন নাই। আমি করেছি। এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন দুইবার করে এসেছি। শুধু গতকাল আসি নাই।'

'গতকাল আসেন নাই কেন?'

'আমার মেয়েটা সিঁড়ি থেকে পড়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলেছে। তাকে হাসপাতালে নিতে হয়েছে– এই জন্যে আসতে পারি নাই।'

'ও আচ্ছা।'

হাদি সাহেব চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানছেন। চৈত্র মাসের গরমেও তার গায়ে খয়েরী রঙের কোট, গলায় টাই। ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য বেশ ভাল। রেগে গেলে আমার মত স্বাস্থ্যের যে কোনো মানুষকে দু'হাতে তুলে আছাড় দিতে পারবেন। হাদি সাহেব চোখ মেলে বললেন, 'মাথায় তিনটা স্টিচ দিতে হয়েছে। আমার মেয়েটার কথা বলছি।'

'বুঝতে পেরেছি। তিনটা স্টিচ। বলেন কি?'

'মেয়েটা অগ্রণী স্কুলে ক্লাস ফোরে পড়ে।'

'নাম কী?'

'ভাল নাম– সৈয়দা মেহেরুন্নেসা খানম। তার দাদীর নামে নাম রেখেছি। ডাক নাম এখনো রাখা হয়নি।'

'ক্লাস ফোরে পড়ে মেয়ে এখনো ডাক নাম রাখেননি। কী বলছেন!'

'কোনো নামই মনে ধরে না। এই জন্যে রাখা হয় নাই।'

'আপনি তাকে কী ডাকেন?'

'যখন যা মনে আসে ডাকি। কয়েক দিন ধরে পাখি ডাকছি।'

'শুধু পাখি ? ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া এইসব কিছু না ?'

'জ্বি না শুধু পাখি।'

সৈয়দ হাদিউজ্জামান খান সাহেবের গলা এখন আর আগের মত শীতল লাগছে না। মেয়ের প্রসঙ্গ আসতেই গলা খানিকটা উষ্ণ হয়েছে। চেহারা থেকে তক্ষক ভাবটাও মনে হয় কিছু দূর হয়েছে। আমার ধারণা ভদ্রলোক যদি নিজ কন্যা প্রসঙ্গে আরো ঘন্টাখানিক কথা বলেন তা হলে চেহারা পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আমি বললাম, ভাই এখন বলুন আমার কাছে কী জন্যে এসেছেন ? মালিহা খালা পাঠিয়েছেন ?

'জ্বি। উনি আপনার জন্যে একটা উপহার পাঠিয়েছেন। আরেকটা চিঠি দিয়েছেন।'

'দেখি উপহারটা কী ?'

'আগে চিঠিটা পড়তে বলেছেন।'

হাদি সাহেব খাম বন্ধ চিঠি বের করে দিলেন। কিছু কিছু মেয়ে আছে যারা দীর্ঘ চিঠি লিখতে পছন্দ করে। 'কেমন আছিস ?' এই সাধারণ বাক্যটাকেও তারা ফেনিয়ে ফেনিয়ে আধা পৃষ্ঠা করে ফেলে। শুধু কেমন আছিস তারা কখনো লিখবে না, তারা লিখবে–

> কী রে তুই কেমন আছিস ? অর্থাৎ তোর শরীর কেমন তাই জানতে চাচ্ছি। শরীরটা ভাল তো ? না-কি শরীর খারাপ ? শরীরের দিকে তো তোর মন নেই। শরীর যদি যায় উত্তরে, তুই যাস দক্ষিণে........

মালিহা খালাও ঐ গোত্রের। তাঁর চিঠি মানে চল্লিশ পাতার মিনি উপন্যাস। তবে আজকের চিঠিটা তুলনামূলক ভাবে সংক্ষিপ্ত। খালা লিখেছেন—

> হিমু,
> তুই কেমন মানুষ বল তো ? গত তিন বছরে আমি খুব কম করে হলেও ত্রিশটা কার্ড পাঠিয়েছি। নিউ ইয়ার্স ডের কার্ড, হ্যালোইনের কার্ড, থ্যাংকস গিভিং-এর কার্ড, ঈদ উপলক্ষে কার্ড। অনেকগুলির সঙ্গে ডলারও ছিল। তুই একটার জবাবও দেয়ার প্রয়োজন মনে করিসনি। তুই এমন কি তালেবর হয়ে গেছিস তা বুঝতে পারছি না। আমি ঠিক করে রেখেছিলাম দেশে ফিরে তোকে কঠিন শাস্তি দেব।

এই শাস্তি তোর প্রাপ্য। কী শাস্তি দেব তাও তোর খালুর সঙ্গে মিলে প্ল্যান করে রেখেছি। তুই যদি ভাবিস আমি ঠাট্টা করছি তাহলে ভুল করবি। আমি মোটেই ঠাট্টা করছি না। শাস্তি ঠিকই দেয়া হবে।

দেশে ফিরেছি পনেরো দিনের মত হল। দু'মাস ছুটির ওয়ান ফোর্থ পার হয়ে গেল তোর সঙ্গে দেখা হল না। আমি আমার বাড়ির কেয়ার টেকারকে এর মধ্যে কতবার যে পাঠিয়েছি। ওর নাম হাদি। স্ট্রেঞ্জ ধরনের মানুষ। আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে ও বোধ হয় তোর কাছে যাচ্ছেই না। তোর কাছে যাবার নাম করে বের হচ্ছে। খানিকটা ঘুরে-ফিরে চলে আসছে।

তোকে আমার খুবই দরকার। কী জন্যে দরকার সাক্ষাতে বলব। ভাল কথা তোর সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার কি এখনো আছে ? না চলে গেছে ? তোকে আমার অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার আছে। আমি মানসিক ভাবে সামান্য হলেও বিপর্যস্ত। ঘুমুতে গেলেই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নটা কী বলি– স্বপ্নে দেখি মুখোশ পরা একটা মানুষ আমার গলায় ইলেকট্রিকের তার পেঁচিয়ে আমাকে মেরে ফেলছে। মানুষটার গায়ে রসুনের গন্ধ। লোকটার পায়ে কোনো জুতা নেই। কালো মোজা পরা পা। যে-ইলেকট্রিকের তার দিয়ে সে আমার গলা পেঁচিয়ে ধরছে সেই তারটার রঙ সবুজ।

আমি আমেরিকায় সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলেছি। তুই বোধ হয় জানিস না– আমেরিকায় সাইকিয়াট্রিস্টের হেল্প নেয়া মানে জলের মত ডলার খরচ করা। জলের মতই ডলার খরচ করেছি। একেকটা সেশনে একশ ডলার করে লেগেছে, লাভ হচ্ছে না কিছু। ওরা হিপনোটিক ড্রাগ দিয়ে চিকিৎসা করছে। এই সব ড্রাগে খুব ঘুম হয়, তবে আরামের ঘুম হয় না। ঘুমের মধ্যেও টের পাওয়া যায় যে মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। আর যদি কোনো কারণে একবার ঘুম ভেঙ্গে যায় তা হলে আর ঘুম আসে না। আমার এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে কোনো বাড়িতে একা থাকতে পারি না। বাথরুমে যদি শাওয়ার নিতে যাই তখন মনে হয় বাথরুমের দরজা খোলা থাকলে কেউ ঢুকে পড়বে। আবার যদি দরজা বন্ধ করি তখন মনে হয় এই বন্ধ দরজা আমি আর খুলতে পারব না। কী যে বিশ্রী অবস্থা। I need your help.

যাই হোক এখন অন্য প্রসঙ্গে কথা বলি। তোর জন্যে একটা উপহার পাঠালাম। কী উপহার আন্দাজ কর তো। তোর তো আবার অনুমান শক্তি খুব ভাল। তোর সঙ্গে প্রথম যে বার দেখা হল সেই কথা মনে আছে না ? ঐ যে তোকে বললাম– হিমু তোর যে সিক্সথ সেন্স খুব

প্রবল– তার একটা প্রমাণ দে তো। বল দেখি আজ আমি দুপুরে কী দিয়ে খেয়েছি। তুই সঙ্গে সঙ্গে বললি– তিন রকমের শুটকি। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। অবশ্যি তোর খালু বলল– সিক্সথ সেন্স, সেভেন্থ সেন্সের কোনো ব্যাপার না। অনেক দিন পর বিদেশ থেকে যারা আসে তারা শুটকি-ফুটকি বেশি খায়। সেই হিসেবে বলেছে। আমি বললাম– তিন ধরনের শুটকির কথাটা কী ভাবে বলল ? তোর খালু বলল, মানুষ তিন সংখ্যা খুব বেশি ব্যবহার করে। ত্রিসন্ধ্যা, তিন কাল, তিন পদ, তে মাথা......সেখান থেকে বলেছে। তোর খালু তোর সিক্সথ সেন্স বিশ্বাস না করলেও আমি করি। এবং ভালই বিশ্বাস করি। এখন তুই তোর ক্ষমতা জাহির করে বল উপহারটা কী ? একটু হিন্টস দিচ্ছি গরুর গলায় যেমন ঘন্টা থাকে তোর জন্যে সে রকম একটা ঘন্টা কিনেছি। গলায় ঘন্টা ঝুলানো গরু যেখানে যায়– ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজে মালিক টের পায় গরু কোথায় গেল। তোর উপহারটাও সে রকম। তুই যেখানে যাবি আমি জানব কোথায় গিয়েছিস। আন্দাজ করতে পারছিস উপহারটা কী ? একশ ডলার বাজি, পারছিস না। যাই হোক তোকে টেনশনে রেখে লাভ নেই আমিই বলে দিচ্ছি। একটা মোবাইল টেলিফোন। তোকে আল্লাহ্‌র দোহাই লাগে। তুই যেখানে যাবি– টেলিফোনটা সঙ্গে নিয়ে যাবি। এটা এমন কোনো ভারী বস্তু না। পকেটে ফেলে রাখলেই হল।

টেলিফোন সঙ্গে নিয়ে যাবি। যাতে ইচ্ছে করলেই আমি টেলিফোনে তোকে পাই। আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে আমি একা একা তিন মিনিটও থাকতে পারি না। কাউকে না কাউকে টেলিফোন করতে হয়। তুই অতি অবশ্যি টেলিফোন সঙ্গে রাখবি এবং অন করে রাখবি। ফোনের বিলের জন্যে তোকে চিন্তা করতে হবে না। আমি বিল দিয়ে দেব। অবশ্যি আমি আমেরিকা ফিরে যাবার পর– You are on your own. অর্থাৎ নিজের বিল নিজে দিবি।

হাদি তোকে খুব ভাল করে বুঝিয়ে দেবে কী ভাবে কল রিসিভ করতে হয়। কী ভাবে কল করতে হয়।

তারপর হিমু তোর খবর কী বল। হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটাহাঁটির রোগটা কি কমেছে না আরো বেড়েছে ? চিকিৎসা না করলে সব ব্যধিই বাড়ে কাজেই আমার ধারণা তোর ব্যধিও বেড়েছে। তবে তোর ব্যধিটা যেহেতু খুব ক্ষতিকর না, কাজেই হজম করা যেতে পারে।

শোন হিমু তোকে আমার জন্যে বেশ কিছু কাজ করতে হবে। কাজগুলি কী আমি পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে লিখছি। নাম্বার ওয়ান......

আমি চিঠি উল্টে দেখলাম সব মিলিয়ে আঠারোটা পয়েন্ট আছে। আঠারোটা পয়েন্ট পড়ার এখন কোনো মানেই হয় না।

আমি চিঠি পড়া বন্ধ করে হাদি সাহেবের দিকে তাকালাম। হাদি সাহেব এতক্ষণ মনে হয় এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। চোখে চোখ পড়া মাত্র চোখ নামিয়ে নিলেন। কিছু কিছু মানুষ আছে কথা বলার সময় চোখের দিকে তাকায় না। অন্য সময় তাকিয়ে থাকে।

হাদি সাহেব মেঝের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন– মেয়েটা এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলেনি।

আমি বললাম, আপনার কথাটা বুঝতে পারিনি। কে চোখের পানি ফেলেনি ?

আমার মেয়েটার কথা বলছি– পাখি। তিনটা স্টিচ দিয়েছে কিন্তু চোখে পানি নেই। আমি শুধু হাত ধরে বসেছিলাম।

'আপনার মেয়ে খুব সাহসী ?'

'জ্বি না সাহসী না, তেলাপোকা ভয় পায়। মাকড়সা ভয় পায়, শয়তানের ঘোড়া নামে একটা সবুজ রঙের পোকা আছে না, ঐটাকেও ভয় পায়। অত্যধিক ভয় পায়। তবে বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখে। যত বড় বিপদ, তার মাথা তত ঠাণ্ডা।'

'এইটুক মেয়ের আবার বিপদ কী ?'

'বিপদ তো আর বয়স বিচার করে না। পঞ্চাশ বছরের একজন মানুষের যে বিপদ আসতে পারে পাঁচ বছরের একজন বাচ্চাও সেই বিপদে পড়তে পারে।'

হাদি সাহেব উপহারের প্যাকেটটা আমাকে দিলেন। আমি আধুনিক গরুর গলার ঘন্টা প্যাকেট খুলে বের করলাম। হাতের তালুতে নেয়ার মত সুন্দর একটা খেলনা। খেলনাটার ব্যবহার হাদি সাহেব যত্ন নিয়ে শেখালেন। কোন বোতামের পর কোন বোতাম টিপতে হয় তা একটা কাগজে লিখেও দিলেন। যাবার আগে হঠাৎ করেই মুগ্ধ গলায় বললেন– বিজ্ঞানের কি উন্নতি হয়েছে দেখেছেন স্যার। লোকজন টেলিফোন পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমি কী ঠিক করেছি জানেন স্যার আমার যদি কোনোদিন টাকা পয়সা হয় আমি এ রকম দু'টা ফোন কিনব। একটা থাকবে আমার কাছে, আরেকটা থাকবে আমার মেয়ের কাছে। এইসব অবশ্য কল্পনা, আমার কোনোদিন টাকা পয়সা হবে না।

'টাকা পয়সা হবে না, কী ভাবে জানেন ?'

'এক ফকির আমাকে বলেছেন। খুবই কামেল দরবেশ। ওনার দেশের বাড়ি বাগের হাট। মাঝে মধ্যে ঢাকায় এক মুরিদের বাড়িতে আসেন। তখন দেখা করি। ওনার জ্বীন সাধনা আছে, পরী সাধনাও আছে। আমাকে বলেছেন একদিন জ্বীন দেখাবেন। মানুষ তো অনেক দেখলাম। একটা জ্বীন দেখার শখ ছিল। স্যার যাই ?'

'আচ্ছা যান। জ্বীন দেখার সুযোগ পেলে আমাকে বলবেন। মানুষ দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এখন জ্বীন-ভূত দেখতে পারলে ভাল লাগার কথা।'

সবার হাতে সব কিছু মানায় না। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকের হাতে বেত মানায় আবার ইউনিভার্সিটির শিক্ষকের হাতে মানায় না। নব্য ব্যবসায়ীর হাতে ব্রীফ কেস মানায়, পুরানো ব্যবসায়ীর হাতে মানায় না। ক্যাডারদের হাতে জর্দার কৌটা মানায় কিন্তু ক্যাডারদের যারা নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের হাতে মানায় না। মোবাইল টেলিফোনেরও কি হাতে মানাবার কোনো ব্যাপার আছে ? হলুদ পাঞ্জাবি পরা খালি পায়ের একটা মানুষ কানে মোবাইল নিয়ে ঘুরছে এটি কি কোনো গ্রহণযোগ্য দৃশ্য ? ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষুক ভিক্ষা করছে এটি বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে গ্রহণযোগ্য দৃশ্য। ভিক্ষাকে সম্মানজনক জীবিকা হিসেবেই ধরা হয়। হঠাৎ কেউ একজন ঠিক করে সে তার বাকি জীবন ভিক্ষা করে কাটাবে। বিষয় সম্পত্তি যা আছে বিক্রী করে সে একটা ঘোড়া কেনে। ভিক্ষুকের যদি ঘোড়া থাকতে পারে, হিমুরও মোবাইল টেলিফোন থাকতে পারে।

হাদি সাহেবের মতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবী ধাই ধাই করে এগুচ্ছে। এমন একটা সময় হয়ত আসবে যখন পৃথিবীর সব মানুষ যে-কোনো সময় একজনের সঙ্গে আরেকজন কথা বলতে পারবে। নাম্বারের বোতাম টিপতে হবে না, মনে মনে ভাবলেই হবে– আমি অমুকের সঙ্গে কথা বলতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে তার গলা শোনা যাবে।

চৈত্র মাসের দুপুরে পথে নেমেই আমার যদি দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে, তাঁর কথা শুধু ভাবলেই হল। সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পি এ'র গলা শোনা যাবে–

'কে বলছেন, হিমু সাহেব ? ভাল আছেন ?'

'জ্বি ভাল।'

"প্রধানমন্ত্রী একটু টয়লেটে গেছেন। জানেন নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীদেরও টয়লেট পায়। আপনি কি একটু ধরবেন না দশ মিনিট পরে করবেন।'

'আমি ধরে আছি।'

'আপনি কোত্থেকে কথা বলছেন?'

'শাহবাগের মোড় থেকে।'

'খুবই গরম পড়েছে তাই না?'

'জ্বি চৈত্রমাসের তালু ফাটা গরম।'

'প্রধানমন্ত্রী এসে গেছেন– ধরুন।'

আমি ধরেই আছি। প্রধানমন্ত্রী মিষ্টি গলায় বললেন, কে হিমু সাহেব?

'জ্বি।'

'চৈত্র মাসের দুপুরে পথে পথে হাঁটছেন?'

'কী করব বলুন।'

'প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে চলে আসুন। ঠাণ্ডা এক গ্লাস সরবত খেয়ে যান। বেলের সরবত।'

'আজ থাক, আরেক দিন।'

'আরেক দিন না। আজই আসুন। আসতেই হবে, না এলে আমি খুব রাগ করব। আপনি কোথায় আছেন বলুন তো গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। থাক থাক কোথায় আছেন বলতে হবে না– আধুনিক টেলিফোন সেটগুলি খুব ভাল বানিয়েছে। আপনি কোথায় আছেন তার কো অর্ডিনেট রেকর্ড হয়ে গেছে। আপনি অপেক্ষা করুন গাড়ি চলে আসছে। খোদা হাফেজ।'

আমি টেলিফোন সেট কান থেকে নামাতে নামাতে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব গাড়ি পোঁ পোঁ করে বাঁশি বাজাতে বাজাতে উপস্থিত হল। উপায় নেই বেলের সরবত খেতে যেতেই হবে।

পোঁ পোঁ গাড়ির শব্দ হচ্ছে ঠিকই। সেই শব্দ প্রধানমন্ত্রীর পাঠানো গাড়ির শব্দ না। এম্বুলেন্স ছুটে যাচ্ছে– সেই শব্দ। একটা সময় ছিল যখন সাইরেন বাজিয়ে এম্বুলেন্স ছুটে গেলে সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবত– আহারে কাকে না জানি নিয়ে যাচ্ছে। বেচারা বাঁচবে তো?

এখন সাইরেন বাঁজিয়ে এম্বুলেন্স গেলে সবাই চোখ সরু করে এম্বুলেন্সের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করে। আজকাল এম্বুলেন্সের ভেতর রুগী

কমই থাকে। চিত্র নায়িকা বসে থাকেন। তাঁকে অতি দ্রুত শুটিং স্পটে নিয়ে যেতে হবে। সাইরেন ছাড়া গতি নেই। টেরার গ্রুপের প্রধানরাও মাঝে মধ্যে থাকেন– শান্তিবাগ এলাকায় ঝন্টু গ্রুপের প্রধান– জনাব ঝন্টু হয়ত যাচ্ছেন। কিংবা যাচ্ছেন ঝন্টু গ্রুপের কাউন্টার– জনাব কানা ছালেক। এক গ্রুপকে মদদ দিচ্ছেন সরকারী দল। আরেক গ্রুপকে মদদ দিচ্ছেন বিরোধী দল। এবং এই দুই গ্রুপকেই মদদ দিচ্ছেন বাংলাদেশের মহান পুলিশ বাহিনী।

ছালেক গ্রুপের প্রধান কানা ছালেক থানায় গেলে ওসি সাহেব লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন– আরে ছালেক ভাই। আপনি দেখি আমাদের ভুলেই গেছেন। আসেনই না। এই ছালেক ভাইকে চা দাও।

ঝন্টু গ্রুপের ঝন্টু সাহেব থানায় গেলেও একই ব্যাপার। ওসি সাহেব অভিমানী গলায় বলেন– আরে ঝন্টু ভাইয়া। না আপনার সঙ্গে কোনো কথা নাই। সেই বুধবারে আপনার সঙ্গে দেখা– তারপর আপনার কোনো খোঁজ নেই। আপনাকে বন্ধু মানুষ ভাবতাম.......

বিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে যাচ্ছে। একশ পাতার বইটির শেষ পাতাটা শিগগিরই উল্টানো হবে। এখন আমরা অদ্ভুত সময় পার করছি। খুবই অদ্ভুত সময়।

আমার মোবাইল টেলিফোন বাজছে। নিশ্চয়ই মালিহা খালা। গলায় ঘন্টা বাঁধা গরুর খোঁজ নিতে চান। গরুর গলায় ঠিকঠাক মত ঘন্টা লাগানো হয়েছে কি-না সেই খোঁজ নেয়া। আমি হাদি সাহেবের ইনস্ট্রাকশন মত সবুজ বোতাম চেপে বললাম– হ্যালো। ও পাশ থেকে পুরুষ গলা শোনা গেল– হিমু সাহেব ?

'জ্বি।'

'আমি হাদি। আপনি টেলিফোন ঠিকঠাক মত ধরতে পারেন কি-না সেটা টেস্ট করার জন্যে করলাম। কিছু মনে করবেন না।'

'টেস্টে মনে হয় পাশ করেছি ?'

'জ্বি। আমার মেয়েটার সঙ্গে একটু কথা বলেন। ও টেলিফোনে কথা বলতে খুবই পছন্দ করে।'

'আপনি কোত্থেকে কথা বলছেন ?'

'আজাদ ফার্মেসী থেকে। আমার বাসার কাছেই ফার্মেসী। মাঝে মধ্যে খুব জরুরি দরকার পড়লে এখান থেকে টেলিফোন করি। আজাদ ফার্মেসীর নাম্বারটা দিচ্ছি আপনি মোবাইলের মেমোরীতে ঢুকিয়ে রাখেন। হঠাৎ

আমাকে কোনো খবর দিতে হলে এখানে খবরটা দিলেই আমি খবর পাব। মেমোরীতে নাম্বার কী ভাবে ঢুকাতে হয় মনে আছে ?'

'মনে আছে। নাম্বার পরে ঢুকাচ্ছি আগে আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলে নেই।'

হাদি সাহেবের মেয়ের সঙ্গে আমার কথা হল।

'হ্যালো কে ? পাখি ?'

'জ্বি।'

'আমি কে তুমি কি জান ?'

'না।'

'অজানা একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলছ ?'

'হুঁ।'

'তোমার গলার স্বরটা এমন লাগছে কেন ? তোমার কি জ্বর ?'

'হ্যাঁ জ্বর আর গলা ব্যথা।'

'খুব বেশি ব্যথা ?'

'হুঁ।'

'তোমার জন্মদিন কবে ?'

'বারো তারিখ।'

'এই মাসের বারো তারিখ ?'

'হ্যাঁ।'

'জন্মদিন করছ না ?'

'বাবা বলছেন জন্মদিন করবে।'

'কী আমাকে দাওয়াত দিলে না তো।'

'ভুলে গেছি।'

'ভুলে গেলে তো কিছু করার নেই। এখন দাও।'

'আপনি আমার জন্মদিনে আসবেন।'

'আচ্ছা আসব। জন্মদিনে কি উপহার তোমার চাই ?'

'একটা ছোট্ট হাতির বাচ্চা।'

'হাতির বাচ্চা ?'

'জ্বি। পুতুল না– আসল হাতির বাচ্চা।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

'সত্যি দেবেন ?'

'হ্যাঁ সত্যি দেব।'

বলে আমি নিজেই হকচকিয়ে গেলাম। কী সর্বনাশের কথা। আমি হাতির বাচ্চা পাব কোথায় ?

পাখি মেয়েটি আনন্দে ঝলমল করতে করতে বলল– হ্যালো আমার গলাব্যথা খুব কমে গেছে।

আমি টেলিফোনে হাদি সাহেবের গলা শুনলাম। হাদি সাহেব মেয়েকে বলছেন, দেখি মা আমি একটু কথা বলি। মেয়ে বলল, তোমাকে দেব না। আমি আসল কথাগুলি এখনো বলিনি।

পাখির আসল কথাগুলি আমি শুনলাম। আসল কথা হল– জন্মদিন হলেও, সেই দিনে তার মা আসতে পারবেন না। কারণ তার মা দেশে থাকেন না। বিদেশে থাকেন। বিদেশে থাকলেও তিনি পাখিকে আকাশের মত ভালবাসেন। পাখির একটা ছোট ভাই আছে সে থাকে মা'র সাথে। সেই ভাইটা পরীদের বাচ্চার মত সুন্দর। তার নাম অমিত। অমিতকে কোলে নিয়ে পাখি চেয়ারে বসে আছে এরকম একটা ছবি পাখির কাছে আছে। ছবিটা সে কাউকে দেখতে দেয় না, তবে আমাকে দেবে। ছবিটা কাউকে দেখতে না দেবার কারণ হল– ছবিতে অমিত খুব কাঁদছে। ছবি দেখলে সবার মনে হতে পারে যে অমিত পাখিকে পছন্দ করে না। আসলে খুবই পছন্দ করে। অমিতের বাবাও পাখিকে পছন্দ করেন। পাখি এবং অমিত দু'জনের মা এক হলেও দু'জনের বাবা ভিন্ন। একটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার তবে লজ্জার ব্যাপার না। এরকম হয়।

বাচ্চা একটা মেয়ের কাছ থেকে এ ধরনের কথা শুনলে মন খারাপ হয়। আমার মন খারাপ হল। যতটা হবার কথা তারচেয়ে বেশি খারাপ হল। মন খারাপ ভাব দূর করার জন্যে এমন কিছু করা দরকার যেন মনটা আরো খারাপ হয়। মন খারাপে মন খারাপে কাটাকাটি। কী করা যায় ? মাথায় কিচ্ছু আসছে না।

শাহ্‌বাগের মোড় পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যেতে পারে। যেতে এক ঘন্টার মত লাগবে। এই ঘন্টায় মন খারাপ করার মত অনেক কিছুই চোখে পড়ার কথা।

আচ্ছা এমন যদি ব্যবস্থা থাকত যে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একজন গুপ্তচর তাদের প্রত্যেকের পাঞ্জাবির পকেটে লুকানো আছে মোবাইল টেলিফোন! তাদের কাজ হচ্ছে শহরে মন খারাপ হবার মত কী কী ঘটনা ঘটছে তা

দেখা এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মন খারাপ দপ্তরে জানানো। দপ্তর ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে ত্বরিত ব্যবস্থা নিচ্ছে।

মনে করা যাক আমি হিমু এমন একজন গুপ্তচর। পাঞ্জাবির পকেটে মোবাইল টেলিফোন নিয়ে বের হয়েছি। মন খারাপ হবার মত একটা ঘটনা চোখে পড়েছে। আমি তৎক্ষনাৎ মন খারাপ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। মন খারাপ দপ্তরের মন্ত্রী (তিনি দেশের একজন প্রধান কবি) উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করছেন–

'ঘটনা কী ?'

'ঘটনা হচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে।'

'বয়স কত ?'

'আনুমানিক বয়স ছয় সাত।'

'কেন কাঁদছে ?'

'রাস্তার মোড়ে গ্যাস বেলুন বিক্রি হচ্ছে– ছেলেটা বেলুন কিনতে চাচ্ছে। বাবা কিনে দিচ্ছে না।'

'কেন দিচ্ছে না ? কারণটা কি অর্থনৈতিক ?'

'কারণ অর্থনৈতিক বলে মনে হচ্ছে না। বাবাকে দেখে মনে হচ্ছে তার টাকা পয়সা আছে।'

'তা হলে বেলুন কিনে দিচ্ছে না কেন ?'

বাবা বলছেন– বেলুন দিয়ে হবেটা কী! একটু পরেই সুতা ছেড়ে দিবি বেলুন চলে যাবে আকাশে।'

'ছেলেটা কি এখনো কাঁদছে ?'

'না এখন কাঁদছে না, এখন সার্টের হাতায় চোখ মুছছে। তবে বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে বেলুনওয়ালার দিকে তাকাচ্ছে।'

'তিনটা বেলুন কিনে এক্ষুনি ছেলেটার হাতে দেবার ব্যবস্থা কর।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'বেলুন পাবার পর ছেলেটার মনের অবস্থা কী হল– এক্ষুনি জানাও আমি লাইনে আছি।'

'জ্বি আচ্ছা।'

নানা ধরনের আন্দোলন চলছে– দারিদ্র্য মুক্ত পৃথিবী আন্দোলন, ক্ষুধা মুক্ত পৃথিবী আন্দোলন। অশ্রু মুক্ত পৃথিবী আন্দোলন কি শুরু করা যায় না ? যে পৃথিবীতে কেউ চোখের পানি ফেলবে না। সেই পৃথিবীর ডিকশনারীতে আনন্দ অশ্রু শব্দটা থাকবে কিন্তু অশ্রু শব্দ থাকবে না।

রাস্তায় নেমে দেখি ধরনী তেতে আছে। পিচের রাস্তায় তো পা ফেলা যাচ্ছে না। ফুটপাথেও না। চৈত্র মাসের দুপুরে খালি পায়ে ঢাকা শহরে হাঁটা অসম্ভব।

লু হাওয়ার মত হাওয়াও বইছে। মরুভূমি কি এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে ? প্রকৃতি নানান খেলা মানুষকে নিয়ে খেলে। শস্য সবুজ জনপদকে মরুভূমি বানিয়ে দেয়– আবার মরুভূমিকে সবুজ করে দেয়। সমস্ত নদ নদী শুকিয়ে বাংলাদেশ কি মরুভূমি হয়ে যাবে ? চকচক করবে বালি। সেই বালির উপর উটের পিঠে চড়ে আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাব। আমাদের ইলেকশনে নৌকা, ধানের শীষ এবং লাঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত হবে উট মার্কা।

আমি পেছনে ফিরলাম, কেউ আমাকে লক্ষ করছে কি-এ দেখা দরকার। পুলিশের কর্তা ব্যক্তি যখন বলেন লোক লাগিয়ে রাখবেন তখন তিনি তাঁর কথা রাখবেন। এক অন্ধ ভিখিরী পেছনে পেছনে আসছে। সে পুলিশের কেউ না তো ? সে হয়ত অন্ধ না, মেকাপ নিয়ে অন্ধ সেজেছে।

জুঁই মেয়েটাকে টেলিফোন করা দরকার। পুলিশ সাহেব যখন পরের বার আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন তখন নিশ্চয়ই বলবেন, তোমাকে টেলিফোন করতে বলেছিলাম, টেলিফোন করনি কেন ?

এখন হাতেই মোবাইল। টেলিফোন করে ঝামেলা চুকিয়ে রাখা ভাল। টেলিফোন নাম্বার লেখা কাগজটা পাঞ্জাবির পকেটেই থাকার কথা। জুঁই-এর সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলব ? প্রথম কিছুক্ষণ চৈত্র মাসের গরম নিয়ে কথা বলা যায় তারপর কী ? আচ্ছা তারপরেরটা তারপরে দেখা যাবে। গায়ক হেমন্তবাবু তো গানের মধ্যে বলেই গেছেন– তার আর পর নেই, নেই কোনো ঠিকানা ........

'হ্যালো !'

'হ্যালো কে বলছেন ? কাকে চাচ্ছেন ?'

আমি আমার মেরুদণ্ডে সামান্য কাঁপন অনুভব করলাম। কথা বলছেন জুঁই-এর বাবা। ভদ্রলোক আজ অফিসে যাননি না-কি ? শরীর খারাপ ? আমি গলার স্বর অতিরিক্ত মসৃণ করে বললাম, স্যার আপনার শরীরটা কি ভাল ?

'হ্যাঁ ভাল। তুমি হিমু না ?'

'ইয়েস স্যার। টেলিফোনে গলা শুনে চিনতে পারবেন বুঝতে পারিনি। জুঁই কেমন আছে স্যার ?'

'ভাল আছে।'

'আপনি অফিসে যাননি কেন ? শরীরটা ভাল না তাই না স্যার ?'

'শরীর ভাল। এবং আমি অফিস থেকেই বলছি। এটা অফিসের নাম্বার। তোমাকে জুঁই-এর নাম্বার বলে অফিসের নাম্বারটাই দেয়া হয়েছে।'

'ও।'

'জুঁই-কে কি কোনো খবর দিতে হবে ?'

'জ্বি-না। শুধু বলবেন যে কোনো একদিন এসে কফি খেয়ে যাব।'

'আচ্ছা বলব।'

'স্যার আরেকটা কথা।'

'বল।'

'আপনি বলেছিলেন আমার পেছনে লোক লাগিয়ে রাখবেন। কিন্তু কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। একজন অন্ধ অনেকক্ষণ ধরে আমার পেছনে পেছনে আসছে কিন্তু তাকে তো আসল অন্ধ বলেই মনে হচ্ছে– চোখের মণি একেবারে কোটর থেকে তুলে নেয়া।'

'সে আমাদের কেউ না। তবে তোমার পেছনে লোক ঠিকই লাগানো আছে।'

'শুনে ভাল লাগছে স্যার। নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে।'

'নিউ অর্লিন্স থেকে তোমার এক খালা এসেছেন– মালিহা। তুমি ডাকো মালু খালা। তোমার এই খালার স্বামীর নাম আরেফিন। তাদের কেয়ার টেকারের নাম হাদি। ঠিক হচ্ছে না ?'

'জ্বি ঠিক হচ্ছে। আমি পুলিশের কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ। আচ্ছা স্যার হাদি সাহেবের মেয়েটার নাম বলতে পারবেন ?'

'না।'

'মেয়েটার নাম পাখি। এ মাসের বারো তারিখে তার জন্মদিন। জন্মদিনে সে একটা হাতির বাচ্চা উপহার চায়। আপনাদের কাছে তো সব খবরই আছে। এই খবরটাও থাকা দরকার। স্যার হাতির বাচ্চা কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারেন। একদিনের জন্যে ভাড়া করতাম।

টেলিফোনের লাইন কেটে গেল। আমি ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললাম।

কেন জানি মনে হচ্ছে হাতির বাচ্চার সমস্যার একটা সমাধান করা যাবে। বড় বড় সমস্যার সমাধান অতি সহজেই করা যায়। ছোট ছোট সমস্যার সমাধান করাই কঠিন।

৩

নতুন জামা উপহার পেলে জামা গায়ে দিয়ে যিনি উপহার দিয়েছেন তাঁকে সালাম করতে হয়। নতুন মোবাইল পেলে কী করতে হয় ? মোবাইল কানে লাগিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম ? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। আমি খালার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ধানমন্ডিতে বাড়ি। এক বিঘা জমির উপর ছিমছাম ধরনের বাড়ি। সামনে বিরাট লন। একটা অংশে আবার চৌবাচ্চার মত আছে। পানি টলটল করছে। সেই পানিতে পেটমোটা রঙ্গিন মাছ। খালার এই বাড়ি মনে হয় রিয়েল এস্টেট কোম্পানীর চোখে পড়েনি। চোখে পড়লে এর মধ্যে ছ'তালা ফ্ল্যাট উঠে পড়ত। স্মার্ট পোশাকের দারোয়ানরা ফ্ল্যাট পাহারা দিত। এইসব দারোয়ানদের আবার সবার হাতেই ট্রাফিক পুলিশের মত বাঁশি। বাচ্চা ছেলেদের মত অকারণে বাঁশি বাজাতেও এরা খুব পছন্দ করে।

মালু খালা দরজা খুলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হচ্ছে চিনতে পারছেন না। চিনতে না পারার কোনোই কারণ নেই। আমার চেহারা আগে যা ছিল এখনো তাই আছে। পোশাক আশাকেও কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমি বললাম, কেমন আছ খালা ?

খালা তাকিয়ে রইলেন জবাব দিলেন না।

'চিনতে পারছ তো ?'

'পারছি। বুক ধড়ফড় করছে। বুক ধড়ফড়ানিটা কমুক তারপর কথা বলি।'

'দরজা থেকে সরে দাঁড়াও ভেতরে ঢুকি। না-কি তুমি চাও না আমি ঢুকি ?'

খালা দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। আমি ঘরে ঢুকে সোফায় বসলাম। পানির বোতল এবং গ্লাস হাতে আমার পাশে বসতে বসতে বললেন–

'বেলটা শুনেই বুক ধড়ফড়ানি শুরু হয়েছে। তোর খালু বাসায় নেই। একা তো এই জন্যে।'

তোমার কী মনে হচ্ছিল ? সবুজ রঙের ইলেকট্রিকের তার নিয়ে কেউ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ? তুমি দরজা খুলবে আর সে তার গলায় পেঁচিয়ে তোমাকে সিলিং ফ্যানে ঝুলিয়ে দেবে ?

খালা ঢক ঢক করে পানি খেতে খেতে বললেন– আসলেই তাই ভেবেছি। পুরোপুরি প্যারানয়েড হয়ে গেছি। হাদিকে পাঠিয়েছি ইলেকট্রিক মিস্ত্রী আনতে। সেই সকালে পাঠিয়েছি এখনো আসছে না।

'ইলেকট্রিক মিস্ত্রী কী করবে ?'

'সিলিং ফ্যান সবগুলো খুলে ফেলবে। আমি এ বাড়িতে কোনো সিলিং ফ্যান রাখব না।'

'সিলিং ফ্যান খুলে লাভটা কী ?'

'স্বপ্নে দেখি সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছে। এই জন্যেই ফ্যান খুলব।'

'ফ্যান খুললেও লাভ হবে না। ফ্যানের হুক তো থাকবে। তোমাকে হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেবে।'

খালা বিরক্ত মুখে বললেন, তুই এই ভাবে কথা বলছিস যেন আমাকে সত্যি সত্যিই ঝুলাবে।'

আমি বললাম, তুমিও এমন ভাব করছ যে সত্যি সত্যি তোমাকে ঝুলানো হচ্ছে।

'আমি বলেছি বলে তুইও বলবি। আমার না হয় মাথার ঠিক নেই। তোর তো মাথা ঠিক আছে।'

'আমার ব্যাপারটা খালা অন্য রকম। আমি যখন যার কাছে থাকি তখন তাঁর মত হয়ে যাই। মাথা খারাপের সঙ্গে থাকলে আমারও মাথা খারাপ থাকে, সুস্থ মাথার মানুষের পাশে আমার মাথাও সুস্থ থাকে। দুষ্ট লোকের কাছে যখন থাকি তখন আমিও দুষ্ট হয়ে যাই। আবার যখন..........

'চুপ কর তো।'

'আচ্ছা চুপ করলাম। খালা সোফা থেকে উঠতে উঠতে বললেন, তোকে দিয়ে আমি একুশটা কাজ করাব। আমি বললাম, চিঠিতে লিখেছিলে আঠারোটা।

'তিনটা বেড়েছে। প্রথম যে কাজটা তুই আমার জন্যে করবি সেটা হচ্ছে– আমার জন্যে একজন কেয়ার টেকার জোগাড় করবি।'

'হাদি সাহেব বিদায় ?'

'অবশ্যই বিদায়। ওকে দেখলেই আমার গা শিরশির করে। তারচে বড় কথা লোকটার গা থেকে রসুনের গন্ধ বের হয়।'

'ও।'

'শুধু ও বললে হবে না। আমি স্বপ্নে যে লোকটাকে দেখি ওর গা থেকেও রসুনের গন্ধ আসত।'

'তা হলে তো বিদেয় করতেই হয়।'

'তুই ভাল রেফারেন্সের একটা লোক বের করবি। আমি প্রতি মাসে চার হাজার টাকা দেই। চার হাজার টাকা খেলা কথা না।'

'তোমার বুক ধড়ফড়ানি কি একটু কমেছে ?'

'হুঁ কমেছে। দিনের বেলা এম্নিতেই কম থাকে। সন্ধ্যার পর বাড়ে।'

'খালু সাহেব কোথায় ?'

'ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তার কী সব পুরানো বন্ধু বান্ধব আছে তাদের কাছে গিয়েছে। চলে আসবে। তুই দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাবি।'

'কী খাওয়াবে ?'

'যা খেতে চাস খাবি। তোকে দেখে কেন জানি খুব মায়া লাগছে। দেখি কাছে আয় গায়ে হাত বুলিয়ে দেই।'

'আগে আমার জন্যে চা নিয়ে এসো। চা খেতে থাকি সেই ফাঁকে গায়ে হাত বুলাও।'

'আমার মধ্যে কোন চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছিস ?'

'পাচ্ছি। তুমি আগের চেয়ে মোটা হয়েছ। অনেক খানি ফুলেছ।'

খালা আহত গলায় বললেন, আমার ওজন কমেছে নয় পাউন্ড। আমি স্পেশাল ডায়াটে আছি। আর তুই বলছিস মোটা হয়েছি ? তুই কি ইচ্ছা করেই উল্টো কথা বলিস ?

'চা খাব খালা।'

'গরমের মধ্যে চা খাবি ? টক দৈ দিয়ে লাচ্ছি বানিয়ে দেই। দৈ ঘরে পেতেছি। দৈ বানানোর একটা যন্ত্র এবার নিয়ে এসেছি। এত সুন্দর দৈ হয় বলার না। আমি আমেরিকায় ফিরে যাবার সময় তোকে দিয়ে যাব।'

'আমি ঐ যন্ত্র দিয়ে কী করব ?'

'দৈ বানাবি। এরকম অবাক হয়ে তাকিয়ে আছিস কেন ? তোকে দেখে মনে হচ্ছে দৈ বানানো ভয়ংকর কোনো কাজ। বোমা বানানোর মত।'

'অনেকটা সে রকমই। খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতি প্রযুক্তির পেছনে সময় নষ্ট করা আমার জন্যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। সে ইচ্ছা করলে ভিক্ষা করে খাবে। কিন্তু হাড়ি পাতিল নিয়ে রান্না করতে বসবে না।'

'ফাজলামি ধরনের কথা বলবি না তো হিমু। আমার অসহ্য লাগে। আয় দৈ কী করে বানাতে হয় দেখে শিখে রাখ। দুপুরে হালকা ধরনের কিছু করব। ভাত টেংরা মাছ টাইপ। রাতে কিছু স্পেশাল ডিশ। রাজস্থানের এক মহিলার কাছ থেকে চিকেনের একটা প্রিপারেশন শিখেছি। অপূর্ব। গ্রীন চিকেন। লাউ পাতা বেটে সবুজ রঙের একটা পেস্ট করা হয়। সেই পেস্টে ভিনিগার মিশিয়ে আস্ত মুরগী মাখিয়ে স্টীম করা হয়। মুরগী স্টীম হতে থাকবে এই ফাঁকে আরেকটা পেস্ট বানাতে হবে। পোস্তা বাটা এবং বাদাম বাটার পেস্ট।'

রান্না বান্নার এইসব কথা শুনতে একটুও ভাল লাগছে না।

'তোর খালুর জ্ঞানের কথার চেয়ে রান্না বান্নার কথা শেখা অনেক ভাল। চুপ করে শোন। পোস্তা বাটা এবং বাদাম বাটার পেস্টের সঙ্গে মিশাবি পেয়াজের রস। তারপর স্টীম মুরগীটার গায়ে এই পেস্ট মাখাবি। বেসন যে ভবে মাখায় সেই ভাবে।'

'হুঁ তারপর।'

'এখন শুনতে মজা লাগছে না?'

'খুবই মজা লাগছে। তারপর বলো–'

'খুব পাতলা কাপড় দিয়ে মুরগীটাকে জড়াবি। সুতা দিয়ে পেঁচাবি যেন কাপড় সরে না যায়।'

'মমীর মত আষ্টে পৃষ্ঠে কাপড় দিয়ে মুড়ানো?'

'হুঁ। এই ভাবে ডীপ ফ্রীজে রেখে দিবি আধ ঘন্টা।'

'লে হালুয়া। এই মুরগী কি ঠাণ্ডায় রান্না হবে?'

'মোটেই ঠাণ্ডায় রান্না হবে না। ডীপ ফ্রীজে রাখা হয়েছে পেস্টটাকে জমাট বাঁধানোর জন্যে।'

'ও আচ্ছা।'

'আধঘন্টা পর ডীপ ফ্রীজ থেকে মুরগীটা তুলে ডুবন্ত ঘিতে ভেজে ফেলবি।'

'কাপড় শুদ্ধ?'

'অবশ্যই কাপড় শুদ্ধ।

'খাব কী ভাবে? কাপড়ও খাব?'

'খাবার সময় কাপড় খুলে নিয়ে খাবি।'

'এই জিনিসই কি আজ হচ্ছে?'

'হ্যাঁ এই জিনিসই হচ্ছে। তুই চোখ এমন কপালে তুলে ফেললি কেন? মুরগী তো আর তোকে রান্না করতে হচ্ছে না। আমি রান্না করব।'

'রান্নার সময় তুমি নিশ্চয়ই আমাকে তোমার পাশে থাকতে বলবে না?'

'না বলব না। তুই বরং টিভি দেখিস। এর মধ্যে তোর খালু সাহেব চলে আসবে। তার সঙ্গে গল্প করবি।'

কলিংবেল বেজে উঠল। মালু খালা বিরক্তিতে চোখ মুখ কুঁচকে বললেন, দরজা খুলে দে তো হাদি এসেছে।

আমি বললাম, বুঝলে কী করে হাদি। খালু সাহেবও তো হতে পারেন।

খালা বললেন, ভক ভক করে রসুনের গন্ধ আসছে। সেখান থেকে বুঝেছি। হাদির গা থেকে রসুনের গন্ধ আসে। তুই রসুনের গন্ধ পাচ্ছিস না?

'না।'

'আমি পাচ্ছি। ভকভক করে গন্ধ আসছে। বুঝলি হিমু আমার সিক্সথ সেন্স বলছে আমার মৃত্যু হবে হাদি ব্যাটার হাতে। কেমন কেমন করে যেন আমার দিকে তাকায়।'

'তোমাকে সে খুনটা করবে কেন? মোটিভ কী?'

'এখানের সবকিছু দেখাশোনা করে সে। সে কিছু একটা গণ্ডগোল করে রেখেছে। আমাকে মেরে ফেললে গণ্ডগোলটা চোখে পড়বে না। As simple as that.'

আমি দরজা খুললাম। খালু সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। নিউ অর্লিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক আরেফিন সাহেব। ভদ্রলোক শুধু যে জ্ঞানী তা না, তাঁর চেহারাও জ্ঞানী জ্ঞানী। তাঁকে দেখলেই মনে হয় জ্ঞানের ঝকঝকে নতুন ডিকশনারী। তাঁর চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি। বাইরে থেকে ঘুরে এসেছেন অথচ তার পাঞ্জাবির ইস্ত্রী এতটুকু নষ্ট হয়নি।

'কেমন আছেন খালু সাহেব।'

'ভাল আছি হিমু সাহেব। দেশে ফিরে তোমাকে না পেয়ে তোমার খালার প্রায় মাথাখারাপ হবার মত জোগাড় হয়েছিল। এখন আশাকরি তার মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে।'

বলতে বলতে খালু সাহেব হাসলেন। সেই হাসিও দেখার মত জ্ঞান ঝরে ঝরে পড়ছে।

'হিমু!'

'জ্বি।'

'এসো বসো আমার সঙ্গে। গল্প করি।'

খালা বললেন, গল্প পরে করবে। আমি এখন রান্না করছি ও আমার পাশে থেকে রান্না দেখবে।'

আরেফিন খালু হাসিমুখে বললেন– আচ্ছা ঠিক আছে। দেখুক। বুঝলে হিমু রান্না হচ্ছে মেয়েদের কাছে একটি শিল্প কর্ম– a creative work. কোনো সৃষ্টিশীল কাজ যখন কেউ করে তখন কাউকে না কাউকে পাশে লাগে যে সেই কাজ এপ্রিশিয়েট করবে। কাজেই তুমি তোমার খালার পাশে থাক। মাঝে মধ্যে আমার কাছে কিছুক্ষণের জন্যে বসতে পার। রান্না বিষয়ক কিছু মজার তথ্য আমার কাছে আছে। হয়তোবা তোমার ভাল লাগবে।

আমি আমার সময়টা তিন ভাগে ভাগ করলাম। কিছুক্ষণ খালার সঙ্গে থাকি। তাঁর রান্না দেখি। কিছুক্ষণ হাদি সাহেবের সঙ্গে থাকি। হাদি সাহেব মিস্ত্রী নিয়ে চলে এসেছেন, তারা দু'জন ফ্যান নামাচ্ছেন। এদের কাজ কর্ম দেখি। তারপর যাই আরেফিন সাহেবের কাছে। মুগ্ধ হয়ে আরেফিন সাহেবের গল্প শুনি– বুঝলে হিমু। রান্না মাত্র তিন রকম,

পোড়া

ভাজা

সিদ্ধ

পৃথিবীর যাবতীয় রান্না এই তিনের পারমুটেশন এন্ড কম্বিনেশন। রান্নার সবচে আদি রেসিপি বইটা কোথায় পাওয়া গেছে জান ?

'জ্বি না।'

'মিশরের পিরামিডের ভেতর। সমাধিকক্ষে। ফারাওদের খাবারের রেসিপি।'

'সেই রেসিপি কি আছে আপনার কাছে ?'

'হ্যাঁ আছে। তোমার খালাকে বলেওছিলাম রেসিপি দেখে রান্না করতে। মিশরের ফারাওদের খাবার খেয়ে দেখি। সে রাজি হয়নি।'

'রাজি হননি কেন ?'

'রেসিপিটা হল ময়ূর রান্নার। পাখা শুদ্ধ আস্ত ময়ূর রান্না করা হয়। সেই ময়ূর খাবার টেবিলে এমন ভাবে সাজানো হয় যেন মনে হয় জীবন্ত ময়ূর বসে আছে। এক্ষুনি উড়ে চলে যাবে। ভাল কথা হিমু বাংলাদেশে কি ময়ূর পাওয়া যায় ?'

'চিড়িয়াখানায় পাওয়া যায় তবে তারা রান্না করে খাবার জন্যে ময়ূর দেবে বলে মনে হয় না। আপনি বললে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'না থাক। ফারাওদের মত ময়ূর খাবার একটা সখ অবশ্যি মাঝে মধ্যে হয়।'

খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে রাত একটা বেজে গেল। আরেফিন খালু বললেন, এত রাতে মেসে ফিরে কী করবে থেকে যাও। পরিচিত বিছানা ছাড়া ঘুম হয় না আশা করি এ ধরনের কোনো ব্যাপার তোমার মধ্যে নেই। অবশ্যি গরমে কষ্ট হবে। ফ্যান খুলে নিয়ে গেছে।

আমি থেকে গেলাম। আরেফিন খালু গল্প করছেন। আমি শুনছি। খালুর কাছে জানা গেল মালু খালা রাতে ভেতর থেকে শক্ত করে দরজা বন্ধ করে একা ঘুমান। দুঃস্বপ্ন দেখার পর থেকে তিনি রাতে খালু সাহেবকে এক বিছানায় নিয়ে ঘুমুতে পারেন না।

'হিমু!'

'জ্বি খালু সাহেব।'

'আমি যে মোটামুটি একটা ভয়াবহ অবস্থায় আছি তা-কি বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'দেখ তো আমার গা দিয়ে রসুনের গন্ধ আসছে কি-না।'

'না-তো।'

'তোমার খালার ধারণা সন্ধ্যার পর থেকে আমার গা দিয়ে রসুনের গন্ধ বের হয়। সহজ স্বাভাবিক ভাবে যে মানুষটা ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ভেতর যে কী পরিমাণ অস্বাভাবিকতা থাকতে পারে– তোমার খালা হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সন্ধ্যার পর থেকে আমি মদ খেতে বসি। রাত দু'টা তিনটা পর্যন্ত খেয়েই যাই। তোমার খালার অসুখ যদি খুব শিগগির না সারে তা হলে আমি পুরোপুরি এলকোহলিক হয়ে যাব। এক দিন দেখা যাবে নিজেই গলায় দড়ি পেঁচিয়ে ফ্যানে ঝুলে পড়েছি।'

'ফ্যানের হুক ঠিকমত লাগানো আছে কি-না দেখে নেবেন। ঝোঁকের মাথায় ঝুলে পড়লেন তারপর ফ্যান নিয়ে ধপাস করে পড়ে কোমর ভেঙ্গে ফেললেন। এটা ঠিক হবে না।'

'রসিকতা করছ?'

'জ্বি।'

'আমার একটা প্রবলেম আছে হিমু। কেউ আমার সঙ্গে রসিকতা করলে আমার ভাল লাগে না।'

'ও।'

'ও না, কথাটা মনে রেখো।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তুমি ঘুমুতে যাও।'

'আপনি ঘুমুবেন না?'

'উহু। বই পড়ব। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি কিছুক্ষণ বই পড়ি। ফিলসফির বই। এটা আমার অনেক দিনের বদ অভ্যাস।'

'আমি না ঘুমানো পর্যন্ত আপনি তা হলে বই পড়তে পারছেন না?'

'না।'

'তা হলে এক কাজ করি। আমি চলে যাই– কারণ আমার ঘুম আসবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'এত রাতে যেতে পারবে?'

'আমি তো ঘোরাফেরা রাতেই করি।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। খালু সাহেব আপত্তি করলেন না। দরজা খুলে দিলেন। ফিলসফির বই পড়াটা মনে হচ্ছে তাঁর জন্যে খুবই জরুরি।

৪

পাখির সঙ্গে কি মোবাইল টেলিফোনের কোনো মিল আছে ? পাখিরা উড়ে বেড়ায়। মোবাইল টেলিফোনও এক জায়গায় স্থির থাকে না– মানুষের হাতে কিংবা পকেটে ঘুরে বেড়ায়। পাখিরা কিচকিচ শব্দ করে মানুষের ঘুম ভাঙায়। মোবাইল ফোনও তাই করে। এই মুহূর্তে আমার ঘুম ভেঙেছে মোবাইল টেলিফোনের শব্দে। আমি টেলিফোন কানে নিয়ে হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে অসম্ভব মিষ্টি গলা শোনা গেল–

'আপনি কি হিমালয় ? বলুন দেখি আমি কে ?'

'বলতে পারছি না। এমন মিষ্টি গলা এর আগে শুনিনি।'

'আচ্ছা আপনাকে তিনটা প্রশ্ন করার সুযোগ দিচ্ছি। তিনটা প্রশ্ন করে যদি জেনে নিতে পারেন আমি কে তা হলে তো জানলেনই। আর না পারলে আমি কে সেই পরিচয় দেব না। কিছুক্ষণ গল্প করব। ও ভাল কথা তিনটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারবেন, কিন্তু নাম জানতে চাইলে পারবেন না। এখন বলুন আপনার প্রথম প্রশ্ন।'

'আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি কেমন আছ ?'

'ভাল আছি।'

'তোমাদের ওখানে কি এখন লোডশেডিং চলছে ? না ইলেকট্রিসিটি আছে।'

'ইলেকট্রিসিটি আছে।'

'এখন বাজে ক'টা ?'

'সকাল ন'টা কুড়ি। আপনার তিনটা প্রশ্ন কিন্তু করা হয়ে গেছে। আপনি কি বুঝতে পেরেছেন আমি কে ?'

'তুমি হচ্ছ জুঁই।'

'আপনি যে প্রশ্নগুলি করেছেন সেখান থেকে আমি যে জুঁই এটা কিন্তু বোঝার কথা না।'

'তুমি কথা বলছিলে আর আমি তোমার গলার স্বর মনে করার চেষ্টা করছিলাম।'

'আপনার টেলিফোন নাম্বার কার কাছ থেকে পেয়েছি জানতে চাইলেন না ?'

'না কারণ আমি অনুমান করতে পারছি। তোমার বাবাকে একদিন টেলিফোন করেছিলাম। সেখান থেকে .... ।

'থাক আর বলতে হবে না। বাবাকে আপনি চেনেন কীভাবে ?'

'এই প্রশ্ন তুমি তোমার বাবাকে করো না কেন ? উনিই জবাবটা ভাল দেবেন।'

'বাবাকে করেছিলাম। বাবা বললেন, আপনি পুলিশের ইনফরমার। মাঝে মধ্যে পুলিশকে গোপন তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনি পুলিশের ইনফরমার শুনে আমার খুব খারাপ লেগেছে।'

'খারাপ লাগার কী আছে। ধরো একটা খুন হয়েছে– আমি খুনী ধরার ব্যাপারে পুলিশকে কিছু গোপন তথ্য দিয়ে সাহায্য করলাম। আমি যা করলাম তা হল সামাজিক দায়িত্ব পালন করা।'

'পুলিশের ইনফরমাররা এই জাতীয় দায়িত্ব পালন করবার জন্যে টাকা নেয়। টাকার বিনিময়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন ব্যাপারটা হাস্যকর না!'

'হ্যাঁ হাস্যকর।'

'আপনি কি পুলিশের ইনফরমার ?'

'এখনো বুঝতে পারছি না।'

'এখনো বুঝতে পারছি না মানে কী ?'

'মানেটা পরে বলব।'

'আমি যে আপনাকে অসম্ভব পছন্দ করি সেটা কি আপনি জানেন ?'

'না জানতাম না। এখন জানলাম।'

'আমি নিজেও জানতাম না। আমি নিজে কখন জানলাম জানেন ?'

'কখন জানলে ?'

'আপনাকে রেখে আঁলিয়াস ফ্রাঁসিসে ক্লাস করতে গেলাম। ক্লাস শেষ করে ফিরে এসে দেখি আপনি নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে পানি এসে গেল এবং আমি বুঝলাম যে আপনাকে আমি অসম্ভব পছন্দ করি। ...'

'ঐদিনের ব্যাপারটা হচ্ছে...'

'ঐদিনের ব্যাপারটা আমি জানতে চাচ্ছি না। আজ রাত আটটার দিকে কি আপনি আমাদের বাড়িতে আসতে পারবেন ?'

'কেন বলো তো ?'

'ডিনারের নিমন্ত্রণ।'

আজ আমার একটু সমস্যা আছে। আজ আমার মালিহা খালার বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ। খালা অতি জরুরি তলব পাঠিয়েছেন। আচ্ছা এক কাজ করা যেতে পারে, ডিনার শেষ করে তোমাদের বাড়িতে যেতে পারি। দশটার দিকে যদি আসি। রাত দশটা কি খুব বেশি রাত ?'

জুঁই খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখল। মেয়েটা ভয়াবহ রাগ করেছে। এই রাগ ভাঙানোর একমাত্র উপায় রাত দশটায় ওদের বাড়িতে উপস্থিত হওয়া। খালি হাতে না, দু'টা বেলীফুলের মালা থাকতে হবে। বাংলাদেশের কোনো মেয়ে বেলীফুলের মালা হাতে নিয়ে রেগে থাকতে পারে না। এই ফুলের গন্ধের ভেতর কিছু আছে– ঝপ করে রাগ কমিয়ে দেয়।

আমি বসে আছি আরেফিন সাহেবের সামনে। ভদ্রলোককে আজ অনেক হাসি খুশি লাগছে। সোফায় পা উঠিয়ে বসেছেন। সফিসটিকেটেড মানুষরা কখনো পা নাচায় না। তিনি পা নাচাচ্ছেন। ব্যাপারটা কী ?

'হিমু!'

'জ্বি।'

'তুমি কেমন আছ বলো তো ?'

'বুঝতে পারছি না কেমন আছি।'

আরেফিন সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, তোমার জবাবটা আমার পছন্দ হয়েছে। হোমোসেপিয়ানসরা বেশিরভাগ সময়ই বুঝতে পারে না তারা কেমন আছে। তাদের নার্ভ সবসময় উত্তেজিত থাকে। উত্তেজিত নার্ভ ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল ঠিকমতো আনা-নেয়া করতে পারে না।

আমি কিছু না-বুঝেই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। আরেফিন সাহেব আগের জায়গায় ফিরে গেলেন— বেতের সোফায় গা এলিয়ে দিলেন। তিনি বসেছেন পা তুলে। দুই হাঁটুর মাঝখানে তাঁর ছোটখাটো মাথাটা দেখা যাচ্ছে। তাঁর মুখ হাসি-হাসি। কালো ফ্রেমের চশমার ভেতরের চোখ দুটিও হাসি-হাসি। আসল হাসি না, নকল হাসি। মানুষের চোখও যে নকল হাসি হাসতে পারে তা এই ভদ্রলোককে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

'হিমু!'

'জ্বি।'

'ময়ূরের নাচ কখনো দেখেছ ?'

'জ্বি না।'

'চিড়িয়াখানার পোষা ময়ূরের আধুনিক নাচ না, বন্য ময়ূরের নাচ। সে এক অসাধারণ দৃশ্য। পুরুষ ময়ূররা সঙ্গিনীদের মনোহরণ করার জন্যে নাচে— সে এক দর্শনীয় জিনিস। সেই নাচের তাল আছে, ছন্দ আছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে হাই বিটের যে-কোনো মিউজিক ফিট করা যায়। কখনো ছন্দপতন হবে না। তবে নাচের চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার একটা আছে। সেটা হচ্ছে নাচ থামানো। ময়ূর নাচ থামায় হঠাৎ। দ্রুতলয়ের যে-কোনো জিনিস থামার একটা নিয়ম আছে। ময়ূরের বেলায় কোনো নিয়ম নেই। তার নাচ হঠাৎ থেমে যাবে। এবং সে নাচ থামিয়ে মাটির দিক তাকিয়ে নিশ্চল হয়ে থাকবে। মনে হবে হঠাৎ কোনো এক গভীর শোকে সে স্তম্ভিত। যেন তার সংসার হঠাৎ ভেঙে গেছে। আর নাচ নয়।'

আমি হাই চাপতে চাপতে বললাম, ইন্টারেস্টিং।

আরেফিন সাহেব বললেন, তোমার ভাবভঙ্গি দেখে তো মনে হচ্ছে না তোমার কাছে ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে। তুমি হাই চাপার চেষ্টা করছ।

'তা অবশ্যি করছি। ঘুম পাচ্ছে।'

'রাত তো মোটে ন'টা এখনই ঘুম পাচ্ছে কেন ?'

'বুঝতে পারছি না কেন। আমি আপনার গল্পের মাঝখানেই ঘুমিয়ে পড়তাম। অভদ্রতা হবে বলে অনেক কষ্টে জেগে আছি। আপনার ময়ূর বিষয়ক গল্প শেষ হয়েছে তো ? না-কি এখনো বাকি আছে ? নাচ শেষ করার পর ময়ূর করে কী ?'

আরেফিন সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, মূল গল্প শেষ হয়েছে। পরিশিষ্ট বাকি আছে। সেটা বলব কি-না বুঝতে পারছি না। যে আগ্রহ নিয়ে গল্প শুনে না তাকে গল্প শুনিয়ে কোনো মজা নেই।

আমি বললাম, ঠিক বলেছেন। আমাদের দেশের মানুষরা বক্তৃতা শুনতে খুবই পছন্দ করে বলেই রাজনীতিবিদরা এত বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার মাঝখানে যদি লোকজন চেঁচিয়ে বলত—'অফ যা' তাহলে বক্তৃতার ডোজ কমত।

'তাতে কী লাভ হত ? বক্তৃতা কমলেই কি কাজ বেশি হয় ?'

আমি বললাম, আপনার ময়ূর বিষয়ক গল্পের শেষটা বলে ফেলুন। আমি এখন উঠব। আপনার এখানে আধঘণ্টা থাকব ভেবে এসেছিলাম। পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে।

'যাবে কোথায় ?'

'কোথায় যাব এখনো ঠিক করিনি।'

আরেফিন সাহেব সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, তুমি কি আসলেই জান না তুমি কোথায় যাবে ? না-কি তুমি জান কিন্তু তোমার চারদিকে রহস্যময়তা তৈরি করার জন্যে এরকম বলো।

আমি গম্ভীর মুখে বললাম, ঠিক ধরেছেন। আমি আমার চারদিকে ইচ্ছা করে ধোঁয়া বানিয়ে রাখি। ভেজা খড় পুড়িয়ে বুনকা বুনকা ধোঁয়া—

কন্যার বাপে হুক্কা খায়
বুনকা বুনকা ধোঁয়া যায়।

আরেফিন সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, হড়বড় করে কী বলছ ? কন্যার বাপে হুক্কা খায়। বুনকা বুনকা ধোঁয়া যায়। এই ছড়াটা কেন বললে, কোন কনটেক্সটে বললে ?

'এমনি বললাম। তেমন কিছু ভেবে বলিনি। মাথায় দু-লাইন ছড়া এসেছে বলে ফেলেছি।'

'মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের পেছনে লজিক থাকবে। কার্যকারণ থাকবে। শুধুমাত্র উন্মাদরাই লজিকের ধার ধারে না। তার মনে যা আসে সে তাই বলে। তুমি নিশ্চয়ই উন্মাদ নও। আমাকে বলো। এক্সপ্লেইন ইট টু মি। ময়ূরের নাচের সঙ্গে কন্যার বাপের হুক্কা খাবার কী সম্পর্ক ?'

আমি আরেফিন সাহেবের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোককে উত্তেজিত মনে হচ্ছে। তিনি যেন হঠাৎ আমার ওপর রেগে গেছেন। এই রাগ তিনি লুকিয়েও রাখছেন না। প্রকাশ করে দিচ্ছেন। তাঁর মতো সফিসটিকেটেড মানুষরা রাগলেও রাগ প্রকাশ করেন না। পাতলা ফিনফিনে রেশমি রুমালে তাদের মুখ ঢাকা থাকে। সেইসব রুমাল ফিল্টারের মতো কাজ করে। মুখের রাগ, বিরক্তি তারা ফিল্টার করে রেখে দেয়।

রাগলে মানুষের মুখ ছোট হয়ে যায়। আরেফিন সাহেবের মুখ এমনিতেই ছোট, এখন আরো এক সাইজ ছোট হয়েছে। তাঁর চোখ আগেও

জ্বলজ্বল করছিল, এখন একটু বেশি জ্বলছে। এটা মদ্যপানের জন্যেও হতে পারে। আমি এসে দেখি তিনি ক্রিস্টালের গ্লাসে হুইস্কি খাচ্ছেন। এই পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তিন গ্লাস হয়েছে। প্রচুর মদ্যপান করলে মানুষের চোখ চকচক করে। এই জ্ঞানও আমার আরেফিন সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া। এলকোহল বেশি পরিমাণে শরীরে ঢুকলে চোখের মণি ডাইলেটেড হয়। তখন আলো বেশি প্রতিফলিত হয়।

'হিমু।'

'জ্বি।'

'ময়ূরের গল্পের শেষটা বলে ফেলি।'

'জ্বি বলুন। আমার ঘুমও কেটে গেছে। এখন আর গল্প শুনতে শুনতে হাই তুলব না।'

'হাই তুললেও ক্ষতি নেই। যারা শিক্ষকতা করে তারা শ্রোতাদের হাই তোলায় বা কথার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়ায় আহত হয় না। এর সঙ্গে তারা পরিচিত। পঞ্চাশ মিনিটের ক্লাসে কম করে হলেও পাঁচটা ছেলে হাই তুলবে। দু'জন ঘুমিয়ে পড়বে। এবং চারজন পাশের বন্ধুর সঙ্গে কাটাকুটি ধরনের খেলা খেলবে।'

আমি ময়ূরের গল্পের শেষ অংশ শোনার জন্যে তৈরি হলাম। ভালো ছাত্র ভালো ছাত্র ভাব করে আরেফিন সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। যেন এটা মানুষের মুখ না— ব্ল্যাকবোর্ড। ব্ল্যাকবোর্ডে চকের লেখা আপনাআপনি ফুটে উঠছে। আমার হাতে নোটবই। নোটবই-এ আমি নোট করছি।

প্রায় একঘণ্টা হাতে ধরে— জ্ঞানী অধ্যাপকের বকবকানি শুনছি— মানুষের পক্ষে যতটুক বিরক্ত হওয়া সম্ভব তারচেয়েও বেশি বিরক্ত হয়েছি। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এর মধ্যে একবারের জন্যেও মালিহা খালা উঁকি দেননি।

আমি কাঁটায় কাঁটায় রাত আটটায় এসেছি। এরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই দীর্ঘদিন দেশের বাইরে কাটিয়েছেন। সময়ের ব্যাপারে এরা খুবই সাবধান। কেউ এলে প্রথম তার দিকে তাকান না, প্রথম তাকান ঘড়ির দিকে। আমি আসার পর থেকে ময়ূর-বিষয়ক জ্ঞানের কথা শুনছি। মালিহা খালার দেখা নেই। আমার ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছে উনি বোধহয় বাসাতেই নেই। বাসায় থাকলে এর মধ্যে কোনো-না-কোনো স্পেশাল ডিশ নিয়ে উপস্থিত হতেন।

খাঁটি বাংলা ধরনের খাবার— যে খাবার রান্না করতে বাঙালি মেয়েরা ভুলে গেছেন, কুমড়ো ফুলের বড়া, খাসির নাড়িভুড়ি ভাজা, গরুর চর্বিতে ফ্রাই করা কটকটি ভাজা। কিন্তু মালিহা খালা ভোলেননি।

আরেফিন সাহেব চশমা ঠিক করতে করতে ময়ূরের গল্পের শেষ অংশ শুরু করলেন। যদিও আমি খুব ভাল করে জানি— এটা শেষ না। শেষের পরেও থাকবে পরিশিষ্ট। পরিশিষ্টের পরে থাকবে উপসংহার। পুনশ্চের পিঠে পুনশ্চ।

'নাচ শেষ করে পুরুষ ময়ূর চারদিকে তার স্পার্ম ছড়িয়ে দেয়। এবং সেই স্পার্ম খুঁটে খুঁটে খায় স্ত্রী ময়ূর। এবং এর ফলে ময়ূরী গর্ভবতী হয়। ইন্টারেস্টিং না?'

আমি বললাম, মোটেই ইন্টারেস্টিং না। ওয়াক থুইং।

'ওয়াক থুইং মানে?'

'ওয়াক থুইং মানে— ওয়াক থু।'

'তুমি কি সবসময় এমন ফানি ভঙ্গিতে কথা বলো?'

'চেষ্টা করি। সবসময় পারি না।'

'আমার মনে হয় সবসময় ফানি হবার চেষ্টা করা ঠিক না। এতে তোমার মধ্যে জোকার-ভাব চলে আসবে। তুমি সবাইকে হাসাবার একটা দায়িত্ব বোধ করতে থাকবে। একটা পর্যায়ে তোমার পার্সোনালিটি কলাপস করবে। আমার ধারণা এখনি করেছে।'

আমি আলোচনার মোড় ঘুরাবার জন্যে বললাম, খালা কি বাসায় নেই?

'বাসায় আছে। তাকে কীজন্যে দরকার বলো।'

'এক কাপ চা খেতাম।'

'কফি হলে চলবে?'

'চলবে।'

'এই মুহূর্তে তোমার খালার সঙ্গে দেখা হবে না। অপেক্ষা করতে হবে। তোমার কফি আমি বানিয়ে আনছি। চিনি ক' চামচ খাও?'

'আমার কোনো ফিক্সড ব্যাপার নাই। যে যা দেয় তাই খাই।'

'Again you are trying to be funny. Please don't do that.'

আরেফিন সাহেব আমার জন্যে কফি আনতে গেলেন। আমার ধারণা কফি নিয়ে এসেই ময়ূর-বিষয়ক গল্পের পরিশিষ্ট শুরু করবেন। ঠাণ্ডা

কফিতে চুমুক দিতে দিতে আমাকে গল্পের পরিশিষ্ট শুনতে হবে। ঠাণ্ডা কফি— কারণ পুরুষমানুষ যখন চা বা কফি বানায় তখন সেই চা-কফি সবসময় ঠাণ্ডা হয়, চিনি বেশি হয়। এবং সেই চা বা কফিতে একটা পুরুষ-পুরুষ গন্ধ থাকে।

আরেফিন সাহেব (তাঁকে সাহেব বলা ঠিক না, আমার বলা উচিত খালু। আরেফিন খালু। আরেফিন নামটাকে শর্ট করে 'আরে-খালু' বললেও খারাপ হয় না।) মগ ভর্তি কফি আমার সামনে রাখতে রাখতে বললেন, বাই এনি চান্স আজ সারাদিনে কি তোমার খালার সঙ্গে তোমার কোনো কথা হয়েছে?

আমি বললাম, হয়েছে।

'ঠিক কখন কথা হয়েছ বলো তো?'

'এগজ্যাক্ট সময় বলতে পারব না। প্রথমবার কথা হয়েছে সন্ধ্যার দিকে। বাংলাদেশে বাস করি তো, সারাক্ষণ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকা আমাদের নিষেধ আছে।'

'দ্বিতীয়বার কখন কথা হল?'

'প্রথমবারের ঘণ্টা খানিক পর।'

'তার কথাবার্তা তোমার কাছে কি অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল?'

'না।'

'সে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে?'

'জ্বি।'

'কেন আসতে বলেছে সেটা কি ব্যাখ্যা করেছে?'

'না। শুধু বলেছেন— খুব জরুরি কথা আছে। আমার ধারণা জরুরি কথা টথা কিছু না, নতুন ধরনের কোনো খাবার খাওয়ার নিমন্ত্রণ।'

'কখন আসতে বলেছে?'

'রাত আটটায়।'

'কফি খেতে কেমন হয়েছে?'

'ভালো হয়েছে। খেতে একটু অন্যরকম। তাতে অসুবিধা নেই।'

'কফি কি কড়া হয়েছে?'

'একটু হয়েছে। আমি কড়া কফি পছন্দ করি।'

'এখানে তুমি একটা ভুল করছ। শীতল পানীয় খেতে হয় কড়া। আর উষ্ণ পানীয় খেতে হয় হালকা করে।'

আমি কফির মগে চুমুক দিতে দিতে বললাম, আপনার এখানে আসা আমার জন্যে শিক্ষাসফরের মতো, কত কী যে শিখি।

আরেফিন সাহেব শীতল গলায় বললেন, তুমি কি আমাকে রিডিক্যুল করার চেষ্টা করছ?

'জ্বি না।'

'আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যারা জোকারি করে তারা জোকারির ফাঁকে ফাঁকে অন্যকে রিডিক্যুল করার চেষ্টাও করে। তুমি কফিটা খাচ্ছ না কেন?'

'ভালো লাগছে না।'

'ভালো না-লাগলেও খেতে হবে।'

'কেন, আপনি বানিয়েছেন বলে?'

আরেফিন সাহেব শান্ত গলায় বললেন, আমি তোমাকে ভয়াবহ কিছু কথা বলব। কথাগুলি শোনার পূর্বশর্ত হচ্ছে— কফি খেয়ে শেষ করা। কফিতে আমি সামান্য রাম মিশিয়ে দিয়েছি। এই রাম তোমার নার্ভকে স্টেবল রাখতে সাহায্য করবে। আমি যে-কথাগুলি বলব তা শোনার জন্যে নার্ভ স্টেবল থাকা দরকার। আমি যে পাঁচ পেগ হুইস্কি খেয়েছি এই কারণে খেয়েছি।

'পাঁচ পেগ হুইস্কি আপনাকে কিছু করতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'আমি খুব শক্ত নার্ভের মানুষ। কতটা শক্ত তা তুমি আন্দাজও করতে পারবে না। যাই হোক কফিটা তাড়াতাড়ি শেষ করো।'

'কফি খাব না। রাম দেয়া কফি খেয়ে অভ্যাস নেই। আমার গা কেমন যেন করছে। শেষটায় ময়ূরের মতো নাচতে শুরু করলে কেলেঙ্কারি।'

'Young man don't try to be funny.'

'খালু সাহেব আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, বলে ফেলুন। আমার নার্ভ আপনার মতো শক্ত না হলেও খারাপ না। প্লাস্টিকের নার্ভ। কোনো কিছুতেই এফেক্ট করে না।'

'তুমি দয়া করে অমাকে খালু সাহেব ডাকবে না। খালু সাহেব শুনতে ভালো লাগে না। আমাকে নাম ধরে ডাকতে পার কোনো সমস্যা নেই।

নাম ধরে ডাকতে খারাপ লাগলে আরেফিন সাহেবও বলতে পার।'

'আপনাকে নাম ধরে ডাকলে মালিহা খালা রাগ করবেন।'

আরেফিন সাহেব অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার মালিহা খালা রাগ করবেন না। রাগ করার মতো অবস্থা তাঁর না। তিনি মারা গেছেন। She is dead like a log.

আমি তাকিয়ে আছি। আরেফিন সাহেব বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে খালি-গ্লাস নিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেলেন। গ্লাস ভর্তি করে ফিরে এলেন। গ্লাসে বরফের টুকরো ভাসছে। গোল করে কাটা লেবুর স্লাইস ভাসছে। তিনি চুমুক দিতে দিতে আসছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে যে-জিনিস তিনি খেতে খেতে আসছেন তা অত্যন্ত স্বাদু।

তিনি আমার সামনে বসতে বসতে বললেন—তুমি যে তোমার খালার মৃত্যুসংবাদ শুনে চেঁচিয়ে ওঠোনি এতে আমি ইমপ্রেসড। মৃত্যু এমন কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার না। মৃত্যুসংবাদ শুনে হাতপা এলিয়ে পড়ে যাওয়াও কোনো কাজের কথা না। বেশিরভাগ মানুষ এরকম করে। যাই হোক এখন আমি পুরো ব্যাপারটা বলব। তুমি মন দিয়ে শোনো।

'খালার ডেডবডি কি ঘরে আছে?'

'ঘরে আছে মানে? রীতিমতো সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে। রুচিকর দৃশ্য না বলেই তোমাকে দেখতে বলছি না। তারপরেও দেখতে চাইলে বসার ঘরের জানালা ফাঁক করে পর্দা সরিয়ে দেখে আসতে পার। দেখতে চাও?'

'না।'

'এক পেগ হুইস্কি খেয়ে দেখবে। এইসব পরিস্থিতিতে হুইস্কি টনিকের মতো কাজ করে।'

'হুইস্কি খাব না। কিন্তু সিগারেট খেতে পারি। আপনার কাছে কি সিগারেট আছে?'

আরেফিন সাহেব সিগারেট-কেইস এবং লাইটার এনে দিলেন। আমি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললাম, খুনটা কি আপনি করেছেন?

আরেফিন সাহেব গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বললেন, তোমার এইরকম সন্দেহ হচ্ছে?

'হ্যাঁ।'

'এরকম সন্দেহ হবার কারণ কী ? আমি খুব স্বাভাবিক আছি এই কারণে ? ঘরে ডেডবডি রেখে ময়ূরের গল্প করছি। হুইস্কি খাচ্ছি। গেস্টকে কফি বানিয়ে খাওয়াচ্ছি... আমাকে খুনি ভাবার পিছনে আমার এইসব কর্মকাণ্ড কি কাজ করছে ?'

'বুঝতে পারছি না। হঠাৎ মনে হয়েছে বলে বললাম।'

'হঠাৎ বলে কিছু নেই। পৃথিবীটা হচ্ছে Cause and effect-এর পৃথিবী। প্রথমে cause তারপর effect. হুট করে তুমি কাউকে খুনি ভাববে না। সেই ভাবনার পেছনে অবশ্যই cause থাকতে হবে।'

'খালা মারা গেছেন কখন ?'

'আমি ডেডবডি ডিটেক্ট করি সন্ধ্যা সাতটা পঁচিশে। আমার মনে হয় মৃত্যুর আগে তোমার খালা তোমার সঙ্গেই শেষ কথা বলেছে।'

'পুলিশকে খবর দিয়েছেন ?'

'না। সব গুছিয়ে নিয়ে পুলিশকে খবর দেব। নয়তো পুলিশ এসে প্রথমেই তোমার মতো প্রশ্ন করবে— খুন কখন করেছেন ? আমি কী বলছি না-বলছি মন দিয়ে শুনবেও না। হ্যান্ডকাফ পরিয়ে নিয়ে যাবে।'

'সব কি গুছিয়ে নিয়েছেন ?'

'না। ধাতস্থ হয়ে নিচ্ছি। আমি একা তো গুছাতে পারব না। তোমাকে নিয়ে গুছাতে হবে।'

আমি বললাম, ও। বলেই স্থির হয়ে গেলাম। স্পষ্ট বুঝতে পারছি বিরাট বড় যন্ত্রণায় পড়তে যাচ্ছি। ভুল বললাম বিরাট যন্ত্রণাতে তো এমনিতেই আছি। পুলিশ ছায়ারমতো পেছনে আছে। এখন পড়ব আরো গভীর যন্ত্রণায়।

আমি বসে আছি জ্ঞানী অধ্যাপকের সামনে। অধ্যাপক সাহেব হালকা নীল রঙের ঢিলেঢালা পোশাক পরে সোফায় পা তুলে বসে আছেন। তাঁর হাতে হুইস্কির গ্লাস। যে বসার ঘরে বসে আছি, তার সাজ-সজ্জাও ইন্টেলেকচুয়েল ধরনের। কার্পেটের উপর শীতল পাটি। শীতল পাটির উপর বেতের সোফা। বেতের সোফার গদিগুলিতে কাঁথা-স্টিচের কভার। দেয়ালে পেইনটিং ঝুলছে। পিকাসোর ব্লু পিরিয়ডে আঁকা ছবির রিপ্রিন্ট। কার্পেটের রঙ বদল হলে পিকাসোও বদলাবেন বলে আমার ধারণা। ঘরে এসি চলছে। আরামদায়ক ঠাণ্ডা। এই বাড়িরই শোবার ঘরে একজন মহিলা সিলিং ফ্যানে ঝুলছেন বিশ্বাস করা কঠিন। অধ্যাপক সাহেব রসিকতা করছেন না তো ? জ্ঞানী মানুষদের রসিকতাগুলিও উঁচুশ্রেণীর হবার কথা।

হয়তো দেখা যাবে মালিহা খালা শোবার ঘর থেকে বের হয়ে বলবেন— হিমু! কখন এসেছিস। জ্বর-জ্বর লাগছিল বলে শুয়েছিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতেই পারিনি। তুই আমাকে ডাকলি না কেন ? ছোট মাছ দিয়ে একটা টকের তরকারি করেছি। খেয়ে দেখ তো !

আরেফিন সাহেব সরু-চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভুরু সামান্য কুঁচকে আছে। চিন্তার ভেতর আছেন বলে মনে হচ্ছে।

'হিমু।'

'জ্বি।'

'আমার প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার মন থেকে সন্দেহটা দূর করা। তোমার মন যদি লজিক্যাল হত তা হলে গোড়াতেই আমাকে সন্দেহ করতে না। তোমার খালার ওজন দু-মণের কাছাকাছি। দুইমণি আলুর বস্তা সিলিং ফ্যানে ঝুলানো আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। এই কাজে অতি অবশ্যই আমার একজন একমপ্লিস লাগবে। একমপ্লিস মানে আশা করি জান। একমপ্লিস মানে হল সাহায্যকারী। এখনো কি তোমার কাছে মনে হচ্ছে তোমার খালার এই গন্ধমাদন পর্বত আমার পক্ষে কপিকল ছাড়া সিলিং ফ্যানে ঝুলানো সম্ভব ?'

'না সম্ভব না।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'দ্বিতীয় লজিক হচ্ছে শোবার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আমার পক্ষে নিশ্চয়ই খুন করে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে বাইরে চলে আসা সম্ভব না।'

'জ্বি না সম্ভব না।'

'তৃতীয় যুক্তিটি মারাত্মক। তোমার খালা একটা সুইসাইড নোট রেখে গেছেন। সো নাইস অব হার। এই সুইসাইড নোটটাই আমাকে রক্ষা করবে।'

'সুইসাইড নোটটা একটু পড়ে দেখি।'

'নিশ্চয়ই পড়ে দেখবে। As a matter of fact তোমারই আগে পড়া উচিত। কারণ সুইসাইড নোটে তোমার নাম আছে।'

'বলেন কী ! আমি কেন ?'

আরেফিন সাহেব পকেট থেকে কাগজ বের করে আমার কাছে দিলেন। এই ভয়াবহ কাগজ নিয়ে ভদ্রলোক এতক্ষণ নির্বিকার ভঙ্গিতে বসেছিলেন তা ভাবাই যায় না।

দেখেই চিনলাম খালার হাতের লেখা। এরকম গুটিগুটি অক্ষরের লেখা স্লিপ আমি বেশ কয়েকটা পেয়েছি। এই কাগজটায় বলপয়েন্টে লেখা—

আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।
আমার প্রিয়জনদের কাছ থেকে আমি
ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কেন এমন ভয়াবহ
সিদ্ধান্ত নিলাম তা হিমু কিছুটা জানে।

ইতি
মালিহা বেগম

আরেফিন সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, তোমার খালার মৃত্যু সম্পর্কে তুমি কী জানো দয়া করে আমাকে বলো। পুলিশের আগে আমি জানতে চাই। আমাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা দরকার।

'আমি কিছুই জানি না।'

'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলেও পুলিশ করবে না। কোনো কিছু না-জানলেও একটা কিছু বের করো। পুলিশকে বলতে হবে। আমি কি তোমাকে কোনো সাজেশান দিতে পারি?'

'দিন।'

'পুলিশকে বলো যে তোমার খালার দাম্পত্য-জীবন ছিল বিষময়। এটা মিথ্যাও না। আমার সম্পর্ক আদায় কাচকলায় এর চেয়েও খারাপ। তোমার খালা এ পর্যন্ত দু'বার আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে।'

'বলেন কী!'

'একবার থ্যাংকস গিভিং ডে-তে টার্কি কাটছিল, তখন আমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হল। তোমার খালা তাঁর টেম্পার লুজ করে ছুরি হাতে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। পাঁচটা স্টিচ লেগেছে।'

'ও।'

'তুমি যেভাবে 'ও' বললে তাতে মনে হল—আমার কথা বিশ্বাস করলে না। ঘটনা অনেকদূর গড়িয়েছিল। পুলিশি তদন্ত হয়েছে। আমেরিকান পুলিশের কাছে রেকর্ড আছে।'

'ও।'

'এইবারের 'ও' টা আগের বারের চেয়ে ভালো হয়েছে। দ্বিতীয়বার খুনের চেষ্টা কী ভাবে করে তা তোমাকে বলতাম। দ্বিতীয়বারের চেষ্টাটা ছিল হাস্যকর ছেলেমানুষী চেষ্টা। কিন্তু হাতে সময় নেই। দশটা বাজে পুলিশ চলে আসবে।'

'পুলিশ কি কাঁটায়-কাঁটায় দশটার সময়ই আসার কথা ?'

আমার কথার জবাব দেবার আগেই কলিং বেল বেজে উঠল।

আমি চমকে আরেফিন সাহেবের দিকে তাকালাম। পুলিশ না তো ? আরেফিন সাহেব বললেন, পুলিশ না। পুলিশ কখনো একবার বেল টেপে না। পৃথিবীর সবচে ভদ্র পুলিশ হল বৃটেনের পুলিশ। এরাও পরপর তিনবার বেল টেপে। যাও দরজা খোলো। আমার পক্ষে দরজা খোলা সম্ভব না। আমার পা টলছে। পাঁচটা হুইস্কি খাওয়া ঠিক হয়নি। আমার লাস্ট লিমিট হচ্ছে চার।

আমি দরজা খুললাম। মালিহা খালা দাঁড়িয়ে আছেন। দু'হাত ভর্তি ব্যাগ। বাজার করে ফিরেছেন বোধ হয়। খালা হাসি মুখে বললেন– তোকে বুদ্ধিমান ছেলে বলে জানতাম। তুই তোর খালু সাহেবের ফাঁদে এভাবে পা দিবি বুঝতেই পারিনি। দরজা ব্লক করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন। একটু সরে দাঁড়া। আর মুখ থেকে জম্বি ভাবটা দূর কর তো।

আরেফিন সাহেব বললেন, কিছু মনে কোরো না হিমু তোমার সঙ্গে একটু প্রাকটিক্যাল জোক করলাম। তোমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে হুইস্কি বলে যা খাচ্ছি– তাও আসলে হুইস্কি না– জাস্ট প্লেইন ওয়াটার। মানুষের সব কথা এমন চট করে বিশ্বাস করবে না। তবে মালিহা, তোমার এই Nephew কঠিন চিজ আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস-করলেও ভড়কায়নি। টাইট হয়ে বসেছিল। I am impressed.

৫

আমার কি উচিত মানুষের সব কথা বিশ্বাস করা ? তর্কে যাকে পাওয়া যায় না, তাকে পাওয়া যায় বিশ্বাসে। তর্ক হল আগুনের মত। যে-আগুনের কাছে এলে বিশ্বাস বাষ্পের মত উবে যায়।

মালিহা খালার বাসা থেকে বের হলাম মন খারাপ করে। খালা এবং তার স্বামী দু'জনে মিলে আমাকে বোকা বানিয়েছে মন খারাপটা সে কারণে না। অন্য কোনো কারণে, যা আমি ধরতে পারছি না। মাথার মধ্যে একই খটকা ঢুকে গেছে। অস্থির বোধ করছি। মনে হচ্ছে কোনো বড় ধরনের সমস্যা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। মন বসছে না। কোনো কিছুতেই মন বসছে না।

অস্থিরতা বিষয়ে আমার বাবা এলার্জিক ছিলেন। পুত্রের প্রতি যে সব উপদেশ রেখে গেছেন তার একটি অস্থিরতা বিষয়ক।

> কখনো কোনো অবস্থাতে অস্থির হইবে না। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান। এই ঘূর্ণিতে তুমি কখনো অস্থিরতা পাইবে না। তুমি পৃথিবীর স্বভাব ধারণ করিবে। মানুষ বাদ্য যন্ত্রের মত। সেই বাদ্য যন্ত্র নিয়ত সংগীত তৈরি করে। অস্থির বাদ্যযন্ত্র সংগীত সৃষ্টিতে অক্ষম। কাজেই তোমার জন্যে অস্থিরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইল। আমি জানি ইহা জগতের কঠিনতম কর্মসমূহের একটি। বাবা হিমু, কাউকে কাউকে তো কঠিনতম কর্মগুলি করিতে হইবে ?

আমি পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিলাম। পকেটবিহীন পাঞ্জাবিগুলিতে আমি এখন বিরাট-বিরাট পকেট লাগিয়েছি। যখন চলাফেরা করি পকেট

ভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে চলা ফেরা করি। এই মুহূর্তে আমার পকেটে মোবাইল টেলিফোন ছাড়া আর যে সব জিনিসপত্র আছে তা হচ্ছে—

১. একটা দেয়াশলাই।

২. সিগারেটের খালি প্যাকেট।
সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। প্যাকেটটা ফেলা হয়নি। পকেটে রেখে দিয়েছি।

৩. একটা মোমবাতি।
বড় সাইজের মোমবাতি। পাঁচ টাকা করে পিস। মোমবাতিটা খুব কাজে লাগে! রাতে কোনো বাসায় গিয়েছি, লোড শেডিং এর কারণে কারেন্ট চলে গেল। ওম্নি ম্যাজিসিয়ানদের মত পকেট থেকে মোমবাতি বের করলাম।

৪. এক শিশি আতর।
আতরের নাম মেশকাতে আম্বর। বিছমিল্লাহ হোটেলের মালিক দয়াল খাঁ উপহার হিসেবে আমাকে দিয়েছেন। অতি উৎকট গন্ধ। দয়াল খাঁ বলেছেন– বিশেষ-বিশেষ সময়ে এই গন্ধই অপূর্ব লাগে। বিশেষ সময় বের করার জন্যেই এই আতরটা দরকার।

৫. একটা হ্যান্ডবিল।
পিজি হাসপাতালের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। বোরকা পরা এক মহিলা হাতে হ্যান্ডবিল ধরিয়ে দিলেন। অনেক মানুষের হাতে হ্যান্ডবিল ধরিয়ে দেবার কাজটা বোরখাপরা মহিলারা করেন না। ইনি করছেন দেখে ভাল লেগেছে বলে হ্যান্ডবিল রেখে দিয়েছি। হ্যান্ডবিলে জনৈক দেওয়ান কফিলউদ্দিন জানাচ্ছেন যে তিনি গ্যারান্টি সহকারে ক্যান্সারের চিকিৎসা করেন। হ্যান্ডবিলটা রেখে দিয়েছি যদি কখনো সুযোগ হয় এই মহান চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলব।

পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে আমি অপেক্ষা করছি। রাস্তা পার হয়ে একজন আমার দিকে আসছেন। তাঁর হাঁটার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে তাঁর পকেটে সিগারেট আছে কিন্তু দেয়াশলাই এর অভাবে ধরাতে পারছেন না। খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে নিশিরাতে যারা চলাফেরা করে তাদের বেশির ভাগের সঙ্গেই দেয়াশলাই বা লাইটার থাকে না।

'ব্রাদার আগুন হবে?'

আমি দেয়াশলাই দিলাম। তিনি সিগারেট ধরালেন। বিচারকের মত দৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন। আমিও তাঁকে দেখলাম। মুখে হালকা বসন্তের

দাগ। ছোট-ছোট চোখ। আশ্বিন মাস হলেও, চাদর গায়ে দেয়ার মত শীত না। কিন্তু তিনি বেশ ভারী একটা চাদর গায়ে দিয়ে আছেন। ভদ্রলোক দেয়াশলাইটা নিজের পকেটে রেখে কিছুই হয়নি ভঙ্গিতে যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকে রওনা হলেন। আমি তাঁকে বললাম না, ভাই দেয়াশলাইটা ফেরত দিয়ে যান। ঢাকা শহরের রাত্রের রাস্তায় কিছু মানুষ চলাফেরা করে যাদের কখনোই কিছু বলতে হয় না। তবে এরা আরেকটু রাত করে নামে, ইনি সকাল-সকাল নেমে পড়েছেন। ট্রাকের পেছনে সাবধানবাণী থাকে একশ হাত দূরে থাকুন। এদের গায়ে কোনো সাবধানবাণী লেখা থাকে না তারপরও এদের কাছ থেকে পাঁচশ হাত দূরে থাকতে হয়।

আমার মন অস্থির হয়ে আছে বলেই বোধহয় লোকটার পেছনে-পেছনে যেতে ইচ্ছা করছে। ঘাতক ট্রাকের পেছনে যে ছোট্ট বেবীটেক্সি থাকে তার স্পীডও এক সময় বেড়ে যায়। সে চলতে থাকে ট্রাকের পেছনের মাডগার্ডে গা লাগিয়ে।

'হিমু ভাই না?'

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি মুসলেম মিয়া। আমার অতি পরিচিত একজন। সাইজে ছোট-খাট পর্বত। বছর পাঁচেক আগে যে মেসে ছিলাম তার বাবুর্চি ছিল। আগুনের আঁচ সহ্য হয় না বলে বাবুর্চির কাজ ছেড়ে ব্যবসায় নেমেছিল। ফ্লাস্কে করে চা বেচা। ভ্রাম্যমান টি স্টল। হাঁটাহাঁটিতে শরীর একটু কমবে এই দুরাশাও ছিল। বাংলাদেশের এমন কোনো ব্যবসা নেই যা সে করেনি। গভীর রাতে যখন হাঁটাহাঁটি করছে তখন নিশ্চয়ই নতুন কোনো ব্যবসা।

'আমারে চিনেছেন? আমি মুসলেম— ফ্লাস্কে কইরা চা বেচতাম।'

'চিনেছি।'

'করেন কী?'

'কিছু করি না। তোমার এখন কিসের ব্যবসা?'

'জিজ্ঞেস কইরেন না ভাইজান। লজ্জা পাব, তয় চুরি-ডাকাতি না।'

'পুরিয়া বিক্রি?'

'ছি, ভাইজান নিশার জিনিস আমি বেঁচব? আমার কথা বাদ দেন? আপনেরে দেইখ্যা মনে হইতেছে মত অত্যধিক খারাপ।'

'ঠিকই ধরেছ।'

'ঘটনা কী ভাইজান ?'

'একজন আমার দেয়াশলাই নিয়ে চলে গেছে। এই জন্যে মনটা খারাপ।'

মুসলেম পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল– ধরেন এইটা সাথে রাখেন। আমি মুসলেম থাকতে আপনে দেয়াশলাই-এর মত তুচ্ছ জিনিসের জন্যে মন খারাপ করবেন। সিগারেট লাগব ?

'দাও।'

মুসলেম আমাকে সিগারেট দিল। আমাকে আড়াল করে নিজেও একটা ধরাল। আমি বললাম, 'বৃষ্টি হবে মুসলেম।'

মুসলেম আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, আসমান ফকফকা। বৃষ্টি হইব না।

'আমার মন বলছে হবে।'

'আপনের মন বললে অবশ্যই হবে। আপনের কথা ভিন্ন।'

'প্রথম বৃষ্টিতে ভিজলে কী হয় জান ?'

'জ্বে না।'

'পাপ কাটা যায়। শরীরের ধুলা-ময়লার সঙ্গে পাপও ধুয়ে-মুছে চলে যায়।'

'ভাইজান এইটা জানতাম না। আপনেরে কে বলেছে ? কোন মৌলানা সাব বলছেন ?'

'কোনো মৌলানা বলেনি, আমার এক খালু বলেছেন। আরেফিন সাহেব। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী। পৃথিবীর অনেক জ্ঞান তিনি হজম করে বসে আছেন। খালুর কাছে শুনেছি অস্ট্রেলীয়ার কিছু আদিবাসি আছে যাদের ধারণা প্রথম বৃষ্টিতে নগ্ন হয়ে স্নান করলে শরীরের ধুলা ময়লার সঙ্গে পাপও ধুয়ে চলে যায়।'

'নেংটা হইয়া গোসল ? তওবা আস্তাগফিরুল্লাহ্ বেশরম জাতি মনে হয়।'

'শরমটা একেক জাতির কাছে একেক রকম– রেইন ফরেস্টে কিছু মানুষ বাস করে এরা নগ্ন হয়ে থাকে। কাপড় পরাটাকেই এরা শরম মনে করে। এরা মনে করে যে সুন্দর শরীর দিয়ে সৃষ্টিকর্তা এদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন কাপড় দিয়ে সেই শরীর ঢাকাটাই সৃষ্টিকর্তার অপমান।'

'এইটাও কি আপনার খালুজান বলেছেন ?'

'হুঁ।'

'ভদ্রলোক বড়ই জ্ঞানী, ওনার কথাটা আমার মনে ধরেছে ভাইজান। আপনে আমারে নিয়া গেলে একবার ওনার পা ছুঁয়ে কদম বুসি করব। দোয়া নিয়া আসব।'

'আচ্ছা নিয়ে যাব।'

মুসলেম ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, পরথম বৃষ্টি রাইতে নামলে নেংটা হইয়া গোসল করতে কোনো অসুবিধা নাই। দিনে নামলে অসুবিধা। পুলিশ ধইরা নিয়া যাবে।"

'তুমি কি নেংটো হয়ে গোসলের কথা ভাবছ?'

মুসলেম দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বলল, পাপ এত বেশি করছি ভাইজান যে কিছু পাপ কাটান দেওন অতি প্রয়োজন। একবার পাপ কাটান দিলে আরো পাপ করণ যায়। পাপ কাটান না-দিয়া শুধু পাপ করলে অসুবিধা না?

'অসুবিধা তো বটেই।'

'বৃষ্টিটা রাইতে নামলে জানে বাঁচি। দিনে পাবলিকের ঝামেলা আছে– তারপরে ধরেন আছে পুলিশ। আসল অপরাধী পুলিশ ধরে না– লেংটা-ফেংটা পাইলে ধইরা নিয়া মাইর দেয়। পুলিশ বড় জটিল জিনিস ভাইজান।'

মুসলেম চিন্তিত চোখে আকাশের দিকে তাকাল। তার মুখে বেশ কয়েকবার পুলিশের কথা শুনে আমার মনে পড়ল জুঁই-এর বাবার কথা। সেখান থেকে জুঁই-এর কথা। বেলীফুলের মালার কথা। এসোসিয়েশন অব আইডিয়া। বেলীফুলের মালা সঙ্গে নিয়ে জুঁই-এর সঙ্গে দেখা করার কথা। রাত কত হয়েছে কে জানে? ফুলের দোকান কি খোলা আছে।

'মুসলেম!'

'জ্বি ভাইজান।'

'বাজে কয়টা?'

'সাথে ঘড়ি নাই তয় ভাইজান রাইত বারটার কম না। উর্ধ্ব রাইত দুইটা, নিম্নে বারটা।'

'এত রাতে কি কোনো ফুলের দোকান খোলা আছে?'

'ফুল দরকার?'

'বেলী ফুলের দু'টা মালা পাওয়া গেলে ভাল হত।'

মুসলেম হাসি মুখে বলল, ঢাকা শহরে তিন চাইরটা ফুলের দোকান আছে সারা রাইত খোলা থাকে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

'ধরেন দুপুর রাইতে হঠাৎ কইরা একটা বিবাহ ঠিক হইল। ফুল দরকার। ফুল পাইব কই ? বেলী ফুলের একটা মালার দাম চাইর টাকা। রাইত তিনটার সময় হেই মালার দাম পনরো টাকা। তিনগুণ লাভ। চলেন আপনেরে মালা কিন্যা দেই। মালার দাম আমি দিব। রিকোয়েস্ট!'

ফুলের দোকান একটা না, বেশ কয়েকটাই খোলা। মুসলেম আমাকে দু'টা মালা কিনে দিল। এবং নিজেও দশটা মালা কিনল।

আমি বললাম, তুমি মালা দিয়ে কী করবে ?

মুসলেম উদাস গলায় বলল, কিছু করব না। সখ হয়েছে কিনে ফেলেছি। শখের জন্যে মানুষে মানুষ খুন করে। আমি দশটা মালা কিনলাম।

'সখে মানুষ খুন করে ?'

'জ্বি করে। আপনার সঙ্গে পরিচয় করায়ে দিব। নাম বাহাদুর। আপনে এখন যাইবেন কই ?'

'জুঁই নামের একটা মেয়ের বাড়িতে যাব। ধানমণ্ডি।'

'আমি আগায়ে দিব ?'

'না আগিয়ে দিতে হবে না।'

মুসলেম বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, ভাইজান বৃষ্টিতে গোসলের সময় ফুলের মালা কি সঙ্গে রাখা যায় ?

'এটা তো জানি না।'

'ফুলের মালা তো আর কাপড় না। এইটা বোধ হয় রাখা যায়। আমি ভাবতেছি ফুলের মালা গলাত দিয়া যদি বৃষ্টির মধ্যে নামি......'

মুসলেম মিয়ার গলার স্বর বদলে গেল। সে ঘোর লাগা চোখে আকাশের দিকে তাকাল। বৃষ্টির প্রতিক্ষা। ধারা বৃষ্টিতে নগ্ন স্নানের ব্যাপারটা মুসলেমের মাথায় ঢুকে গেছে। ব্যাপারটা সে মাথা থেকে বের করতে পারছে না। বার করার চেষ্টাও করছে না বরং উল্টো আরও ভালমত ঢুকানোর ব্যবস্থা করছে। এ ধরনের ব্যাপার আমি আগেও লক্ষ করেছি— হঠাৎ কোনো একটা ব্যাপার মানুষের মাথায় ঢুকে যায়। হাজার চেষ্টা করেও সে এটা বের করতে পারে না।

আমি একজনকে জানি যার মাথায় শিমুল গাছের লাল ফুল কী করে যেন ঢুকে গিয়েছিল। প্রথম দিকে সে শিমুল গাছ দেখলেই থমকে দাঁড়িয়ে যেত। মুগ্ধ গলায় বলত– বাহ্ কী সুন্দর লাল টকটকা ফুল। তারপর সে উচ্ছ্বসিত হতে শুরু করল। বলতে শুরু করল, গাছের মাথায় কী আগুন

লাগছে ! আগুন নিভাতে দমকল লাগব। যত দিন যেতে লাগল শিমুল ফুল তার মাথায় ততই ঢুকে যেতে লাগল। শেষের দিকে তার কাজ হল শিমুল গাছের সঙ্গে কথা বলা। যখন ফুল ফোটার সময় না, তখন সে গাছের কাছে যাবে। গাছকে বলবে, হ্যালো বৃক্ষ। এই বৎসর মাথায় ঠিকমত আগুন লাগাতে পারবি তো ? দেখিস আগুন যেন ঠিকঠাক লাগে। ইজ্জতকা সাওয়াল। গত বছর তোর আগুন জমে নাই। লালটা কমতি ছিল।

তার আত্মীয়-স্বজনরা নানান রকম চিকিৎসার চেষ্টা করল। শেষটায় রাচি মানসিক হাসাপাতালেও নিয়ে গেল। ডাক্তাররা পরীক্ষা-টরীক্ষা করে বললেন, কিছু করার নেই। তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা হল, ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হত। কোনো একটা সুযোগ পেলেই সে ঘর থেকে বের হয়ে শিমুল গাছের মগডালে বসে থাকতো। শিমুল গাছে থেকে পড়ে গিয়ে ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়।

গভীর রাতে কোনো বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়ালে দারোয়ান তড়াক করে লাফ দিয়ে ওঠে। অত্যন্ত সন্দেহজনক চোখে তাকায়। এই বাড়ির দারোয়ানেরা তা করল না। কারণ এরা দারোয়ান না—পুলিশ। পুলিশ সাহেবের বাড়ি পুলিশ পাহারা দেবে এটাই স্বাভাবিক। পুলিশের আচরণ দারোয়ানদের মত হবে না, এটাও স্বাভাবিক। আমি গেটের সামনে দাঁড়াতেই দু'জন পুলিশের একজন কাছে চলে এল এবং খুবই ভদ্র গলায় বলল, কাকে চাচ্ছেন ?

আমি বললাম, এটা জুঁইদের বাড়ি না ? আমি জুঁই এর কাছে এসেছি। দয়া করে একটু খবর দিন। বলুন– হিমু।

'খবর দিতে হবে না। যান ভেতরে যান।'

পুলিশের ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হল— জুঁই আগেই গেটে বলে রেখেছে।

পুলিশ গলা নীচু করে বলল, বসার ঘরের দরজা খোলা। সবাই আপনার জন্যে বসে আছে।

পুলিশের এই কথার অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হল না। সবাই আমার জন্যে বসে থাকবে কেন ? জুঁই বসে থাকতে পারে। সবাই মানে কী ? জুঁই এবং তার বাবা ? পিতা ও কন্যা ?

আমি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে ধাক্কার মত খেলাম। রুদ্ধ দ্বার বৈঠকের মত পরিস্থিতি। পাঁচজন পুরুষ মানুষ বসে আছেন। একজনের গায়ে পুলিশের ইউনিফর্ম। মনে হচ্ছে অতি গোপন কোনো আলোচনা চলছে।

সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ ঘরে কেউ ঢুকলে সবাই তার দিকে তাকাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এক দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকবে এটা স্বাভাবিক না। জুঁই এর বাবা উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার কাছে চলে এলেন। আমার স্লামালিকুম বলা উচিত কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে সামাজিক সৌজন্য না-করলেও হয়। ভদ্রলোক শান্ত গলায় বললেন, জুঁই কোথায় ?

আমি মিষ্টি করে হাসলাম। যে হাসির অর্থ– জুঁই কোথায় বলছি। এত অধৈর্য হচ্ছেন কেন ?

পরিস্থিতি এমন যে আমি যদি বলি জুঁই কোথায় তা তো জানি না। তা হলে শুরুতেই ভয়ংকর কিছু হয়ে যেতে পারে। ঝড়ের প্রথম ঝাপ্টাটা মধুর হাসি দিয়ে সামলানো হলো। এখন দ্বিতীয় ঝাপটার প্রস্তুতি। ঝড়ের দ্বিতীয় ঝাপটা প্রথম ঝাপটার মত শক্তিশালী হয় না। এবং দ্বিতীয় ঝাপ্টার জন্যে এখন আমার মানসিক প্রস্তুতি আছে। প্রথমটার জন্যে ছিল না।

জুঁই-এর বাবা বললেন, এসো বসো।

আমি গোল টেবিল বৈঠকে সামিল হলাম। জুঁই এর বাবা আমার দিকে ইঙ্গিত করে অন্যদের বললেন— এ হিমু।

এক সঙ্গে সবার চোখ সরু হয়ে গেল। অর্থাৎ আমার নামের সঙ্গে এরা পরিচিত।

জুঁই-এর বাবা বললেন, হিমু এখন বল জুঁই কোথায় ? কোন হাংকি পাংকি না। স্ট্রেইট কথা বলবে।

মধুর হাসি দ্বিতীয়বার দেয়া ঠিক হবে কি-না আমি বুঝতে পারছি না। ঝড়ের দ্বিতীয় ঝাপ্টা শুরু হয়েছে। সমস্যা হল, এই ঝাপ্টা প্রথমটার মতই শক্তিশালী। আমি কী করব বুঝতে পারছি না।

বড় ধরনের বিপদে প্রকৃতি নিজে হাল ধরে। এখানেও তাই হল। হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। পুরো বাড়ি অন্ধকারে ডুবে গেল। বড়লোকদের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি চলে গেলেও সমস্যা হয় না। তাদের নানান ব্যবস্থা থাকে– জেনারেটার চালু হয়ে যায়, আই পি এস চালু হয়। এক সঙ্গে অনেকগুলি চার্জ লাইট জ্বলে উঠে। এখানে তা হচ্ছে না। অন্ধকার বাড়ি, অন্ধকারই হয়ে আছে।

একজন অতি বিরক্ত গলায় বলল, রাত একটার সময় কিসের লোড শেডিং ? কল কারখানা সবই তো এখন বন্ধ। স্যার আপনার বাড়িতে আই পি এস নেই ?

জুঁই-এর বাবা বললেন, আছে। ইলেকট্রিক্যাল লাইনে কী যেন সমস্যা হয়েছে। এই রহমত! মোমবাতি জ্বালাও।

অন্ধকার ঘরে ছোটাছুটি হচ্ছে। মোমবাতি পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পকেট থেকে মোমবাতি বের করলাম– দেয়াশলাই দিয়ে মোমবাতি জ্বালালাম। খাকি পোষাক পরা ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি পকেটে মোমবাতি নিয়ে ঘুরে বেড়ান?

আমি বললাম, জ্বি স্যার। কখন দরকার পড়ে যায়।

পরিস্থিতি এখন সামান্য হলেও আমার দিকে। সবাইকে সামান্য হলেও হকচকিয়ে দিয়েছি। এখন আমি যা বলব সবাই তা শুনবে। সামান্য একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে এই অসামান্য ব্যাপারটা করা হয়েছে। আমি জুঁই-এর বাবার দিকে তাকিয়ে বললাম, স্যার জুঁই কোথায় আমি জানি না। রাত দশটায় এই বাড়িতে এসে আমার কফি খাবার কথা। আসতে সামান্য দেরি হয়েছে। জুঁই এত রাতেও বাড়িতে ফেরেনি শুনে আমি অবাক হচ্ছি।

'তুমি বলতে চাচ্ছ তুমি তার where abouts জান না?'

'জ্বি না।'

'তোমার সঙ্গে মোবাইল আছে না?'

'জ্বি আছে।'

'অন করা আছে?'

'জ্বি আছে।'

'সে মোবাইলে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি?'

'জ্বি না।'

আমি লক্ষ করলাম জুঁই-এর বাবার সঙ্গে খাকি পোষাক পরা ভদ্রলোকের চোখের ইশারায় কিছু কথা হচ্ছে। মোমবাতির অল্প আলোয় চোখের ভাষা ঠিক পড়া যাচ্ছে না। অবশ্যি আলো বেশি থাকলেও লাভ হত না। চোখের ভাষা একেক শ্রেণীর জন্যে একেক রকম। অফিসের কেরাণীদের চোখের ভাষা, এবং পুলিশের চোখের ভাষা এক না। আমি শুধু রাস্তায় যারা হাঁটাহাটি করে তাদের চোখের ভাষা পড়তে পারি। অন্যদেরটা পারি না।

'হিমু!'

'জ্বি স্যার।'

'জুঁই আজ সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বের হয়েছে। এখন রাত বাজছে একটা কুড়ি। এখনো ফিরছে না।'

'কোনো বান্ধবীর বাড়িতে বসে আড্ডা দিচ্ছে। আড্ডা দিতে গিয়ে এত রাত হয়ে গেছে বুঝতে পারেনি। ওদের আবার টেলিফোনও নষ্ট। খবর দিতে পারছে না।'

'হিমু শোনো, তোমার এত কথা বলার দরকার নেই। তুমি যেখানে থাক সেখানে চলে যাও। জুঁই খুব সম্ভব তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। এবং যোগাযোগ করা মাত্র আমাকে জানাবে।'

'জ্বি আচ্ছা। আমি কি এখনই চলে যাব?'

'হ্যাঁ। গাড়ি তোমাকে নামিয়ে দেবে।'

'কোনো দরকার নেই স্যার।'

'তোমার দরকার না থাকতে পারে। আমার আছে।'

আমি ফু দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে মোমবাতিটা আবার পকেটে ভরে উঠে দাঁড়ালাম। আমার মোমবাতি আমি নিয়ে যাব এটাই স্বাভাবিক। মাঝে মধ্যে খুব স্বাভাবিক কাজও আশেপাশের সবার চোখে অস্বাভাবিক মনে হয়। যে পাঁচজন বৈঠক করছেন তাদের কাছে আমার আচরণ খুবই অস্বাভাবিক লাগছে তা বুঝতে পারছি। লাগুক অস্বাভাবিক।

মানুষকে সব সময় স্বাভাবিক লাগবে এটা কোনো কাজের কথা না। প্রাণী হিসেবে মানুষ অস্বাভাবিক। সে স্বাভাবিকের ভঙ্গি করে পৃথিবীতে বাস করে। আমি পুলিশের গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, জুঁই-এর বাবা বের হয়ে এলেন এবং গম্ভীর গলায় বললেন, এক কাজ করো তুমি তোমার মোবাইলটা রেখে যাও।

আমি মোবাইল তাঁর হাতে দিলাম। তিনি বললেন, পুলিশের গাড়িতে করে তোমাকে পৌঁছে দেয়া ঠিক হবে না। তুমি হেঁটে চলে যাও। আমি বললাম, জ্বি আচ্ছা স্যার।

৬

খবরটা ছাপা হয়েছে পত্রিকার প্রথম পাতায়। ছবি সহ বক্স নিউজ। এখনকার পত্রিকাগুলি অন্যরকম হয়ে গেছে, গুরুত্বহীন খবরগুলি প্রথমপাতায় ছাপা হয়। মিথ্যা খবর দিয়ে লিড নিউজ আসে। আগে ধর্ষণ সংক্রান্ত খবরগুলি ছাপা হত ম্যাগাজিনে। দৈনিক পত্রিকাওয়ালারা দেখল– এমন একটা 'মজাদার আইটেম' তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে– তারাও শুরু করল ধারাবাহিক ধর্ষণ প্রতিবেদন।

ধর্ষণের পরের আইটেম ধারাবাহিক গালাগালি প্রতিবেদন। সরকার প্রধান বিরোধীদলকে গালি দিয়ে কী বললেন, আবার বিরোধীদলের প্রধান সরকারকে গালাগালি দিয়ে কী বললেন তার বিশদ বর্ণনা।

রাজনীতির খেলা যত জমে পত্রিকাওয়ালাদের ততই রমরমা। রাজনীতিবিদরা তাদের খেলা খেলেন, পত্রিকাওয়ালারা খেলেন তাঁদের খেলা। তারা যে নিরপেক্ষ ভাবে খেলেন, তা না। প্রতিটি পত্রিকামালিক কোনো-না-কোনো রাজনীতিবিদের থলেতে বসে খেলেন। এই সিনড্রমের একটা নাম ক্যাঙ্গারু সিনড্রম। ক্যাঙ্গারুর ছানার মত থলেয় বসে খেলাধুলা।

আজকের প্রথম পাতায় বক্স করে ছাপা সংবাদটার সঙ্গে রাজনীতি জড়িত না, হিমুনীতি খানিকটা জড়িত বলে খবরটা দু'বার পড়লাম। পত্রিকা পড়া আমার কাজ না। আজকের কাগজটা কিনিয়েছি জুঁই এর কোন খবর পত্রিকায় উঠেছে কি-না দেখার জন্যে। "পুলিশ কর্মকর্তার কন্যা নিখোঁজ" এই শিরোনামে পত্রিকাওয়ালারা কিছু লিখেছে কি ? কন্যা নিখোঁজ আইটেম ধর্ষণের মত ইন্টারেষ্টিং না হলেও খারাপ না।

এ জাতীয় কোনো খবর নেই। তবে অন্য খবর আছে। প্রথম পাতায় সেই খবর পেয়ে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল–

**তপ্ত নগরীতে প্রথম বৃষ্টিধারা**
**এক দল নগ্ন মানুষের উল্লাস নৃত্য**
(নিজস্ব প্রতিবেদন)

দীর্ঘ দাবদাহের পর গতকাল রাজধানীতে শান্তির বারিধারা হয়েছে। রাত একটার দিকে হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তুমুল ঝড়ো বাতাস বইতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুষল ধারে বর্ষণ শুরু হয়। দাবদাহে অতিষ্ঠ মানুষের মনে নেমে আসে প্রশান্তি।

এই সঙ্গে নিউ পল্টন এলাকায় একটি অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। জনৈক বিশালবপু মুসলেম মিয়ার নেতৃত্বে একদল মানুষ বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ দিগম্বর হয়ে নাচতে শুরু করে। তাদের প্রত্যেকের গলায় ছিল বেলী ফুলের মালা। তাদের উদ্দাম নৃত্য দেখে আতংকিত কিছু মানুষ পুলিশে খবর দেন। পুলিশ অকুস্থলে উপস্থিত হওয়া মাত্র নৃত্যরত নগ্নদলের সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে, শুধু নাটের গুরু মুসলেম মিয়া পুলিশের হাতে ধৃত হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মুসলেম বলে, প্রথম বৃষ্টিতে নগ্ন নৃত্য করলে পাপ কাটা যায়। সে যেহেতু বিরাট পাপী ব্যক্তি, পাপ কাটানোর জন্যেই সে এই কাণ্ড করেছে। পুলিশ আরো জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে তাকে দু'দিনের রিমান্ডে নেবার আয়োজন করেছে।

পুলিশ হাজতে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে মুসলেম মিয়ার কিছু কথাবার্তা হয়। প্রতিবেদককে সে জানায়— প্রথম বৃষ্টিতে নগ্ন স্নান করার ফলে সে এখন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। এমন নিষ্পাপ অবস্থাতেই সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চায়। প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলার সময় তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। উল্লেখ্য প্রতিবেদকের সঙ্গে কথাবার্তা চলাকালীন পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাকে পরিধানের জন্যে একটি লুংগী দিলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে।

ঘটনাটি জনমনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। আগামীকাল মুসলেম মিয়া এবং তার জীবন দর্শন নিয়ে আমরা একটি সম্পূর্ণ প্রতিবেদন পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেব।

প্রতিবেদন পড়ে আমি হিমু কিছুক্ষণ ঝিমু হয়ে বসে রইলাম। পত্রিকাওয়ালারা মুসলেম মিয়াকে নিয়ে যে হৈ চৈ টা করবে তা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। প্রতিবেদনের পর প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। একদল মানুষের কাছে সে রাতারাতি আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন সাধক হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে। তাকে নিয়ে নানান ধরনের বিস্ময়কর খবর রটতে থাকবে। একটা সময়ে রাজনীতিবিদরা, মন্ত্রীরা, বড় বড় আমলারা

গভীর রাতে গোপনে গাড়িতে করে তার কাছে আসতে শুরু করবেন। কারণ নেংটা বাবার দোয়া তাদের দরকার।

পুলিশ দু'একদিনের মধ্যে আমাকে এসে ধরে নিয়ে যাবে এই আশঙ্কাও আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না। মুসলেম মিয়া আমার নামটা পুলিশের কাছে বললেই আমি ফেঁসে যাব। পুলিশ জোর তদন্ত শুরু করে দেবে। যে-কোনো হাস্যকর ব্যাপারে জোর তদন্ত চালাতে পুলিশ বড়ই ভালবাসে।

আমার মনে ক্ষীণ সন্দেহ হতে লাগল– আজই আমাকে পুলিশ ধরবে, ঘন্টা দু'তিনেকের মধ্যেই পুলিশের জীপ এসে উপস্থিত হবে। এটাকে সিক্সথ সেন্স বলব কি-না বুঝতে পারছি না। সিক্সথ সেন্সই হোক আর সেভেনথ সেন্সই হোক হাজতে যেতে হলে তার জন্যে প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। বাথরুম সারতে হবে (বড়টা)। হাজতে নেবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রথম যে জিনিসটা পায় তার নাম বড় বাথরুম। হাজতে বাথরুমের ব্যবস্থা নেই। বাথরুম পেলে গার্ড পুলিশের কাছে অনেকক্ষণ ধরে হাত কচলাতে হয়, নরম গলায় অনেক আবেদন নিবেদন করতে হয়। গার্ড সাহেবের দয়া হলে হাজতের ঘর খুলে তিনি বাথরুমে নিয়ে যান।

মাথার চুল কাটতে হবে। সবচে ভাল মাথাটা কামিয়ে ফেললে। চুল বড় বড় থাকলে খুবই গরম লাগে। তারচেয়েও বড় কথা প্রথম রাত কাটিয়ে দ্বিতীয় রাতে পড়লেই মাথা ভর্তি হয়ে যায় উকুনে। উকুনগুলি বাইরে থেকে আসে, না এক রাতেই মাথায় গজায় এই রহস্যের মিমাংসা আমি এখনো করতে পারিনি। হাজতি-উকুনের আরেকটা মজার ব্যাপারে হচ্ছে, হাজত থেকে ছাড়া পাবার সঙ্গে-সঙ্গে উকুনও চলে যায়। হাজতি-উকুন মনে হয় হাজত ছাড়া অন্য কোনো পরিবেশে বাঁচে না।

আমি হাজত বাসের প্রস্তুতি নিয়ে বড় বাথরুম সারলাম। রাস্তার পাশে ইটালিয়ান সেলুন থেকে তিন টাকা দিয়ে মাথা নেড়া করলাম। নাপিত আবার মাথা নেড়ার পর কিছুক্ষণ মাথা মালিশ করে দিল। যে উৎসাহের সঙ্গে নাপিত মাথা মালিশ করল তাতে মনে হল– মাথা মালিশ করে সে খুবই মজা পেয়েছে।

মেসে ফিরে দেখি পুলিশ এসে গেছে। একজন সাব ইন্সপেক্টর ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে আমার ঘরের সামনে পায়চারি করছেন। তিনি আমাকে দেখেই প্রায় হুংকার দিলেন। ভুল ইংরেজিতে বললেন— You name Himu ?

আমি বললাম, ইয়েস স্যার। I name Himu.

তিনি দ্বিতীয়বার হুংকার দিলেন— এবারের হুংকার খাঁটি বাংলা ভাষায়, চল থানায় চল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, স্যার চলুন।

থানায় ওসি সাহেব আমার পূর্ব পরিচিত। নাম রকিব উদ্দিন, চাঁদপুরে বাড়ি। বছর দুই আগে তিনি কিছুদিন আমাকে হাজতে রেখেছিলেন। অত্যন্ত উগ্রমেজাজের মানুষ, তবে শেষের দিকে তাঁর সঙ্গে আমার খুবই খাতির হয়ে গিয়েছিল। সেই খাতির এখন কাজ করার কথা না। পুলিশ বড়ই বিস্মরণ প্রিয়। তারা অতীত মনে রাখে না। রকিবউদ্দিন সাহেব মনে রাখবেন সেই আশা আমি করিনি। দেখা গেল ভদ্রলোকের মনে আছে। আমার দিকে কিছুক্ষণ বিরক্ত চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, বসুন। আমি বসলাম। যে সেকেন্ড অফিসার আমাকে ধরে নিয়ে এসেছেন রকিব উদ্দিন সাহেব তার দিকে তাকিয়ে আগের চেয়েও বিরক্ত গলায় বললেন, হ্যাণ্ডকাফ লাগিয়েছেন কেন ? হ্যান্ডকাফ লাগানোর দরকার ছিল না। খুলে দিন।

আমার হ্যান্ডকাফ খুলে দেয়া হল। ওসি সাহেব চা দিতে বললেন।

চা দেয়া হল।

সিগারেটের প্যাকেট এবং দেয়াশলাই আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি সিগারেট ধরালাম।

রকিবউদ্দিন এবার আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, আজই মাথা কামিয়েছেন ?

আমি বললাম, জ্বি।

'মাথা কামিয়েছেন কেন ?'

পুলিশের লোকজন সত্যি কথা কখনই গ্রহণ করতে পারে না। উদ্ভট মিথ্যা তারা খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে। মাথা কেন কামিয়েছি এই সত্য বলে লাভ হবে না, নানান ভাবে পেঁচাবে। মাথা কামানো নিয়ে ঘন্টা খানিক কথা বলতে হবে তারচে মিথ্যা বলাই ভাল। আমি বললাম, আজ একটি বিশেষ দিন। বৌদ্ধ পূর্ণিমা। এই পূর্ণিমায় মহামতি সিদ্ধার্থ মস্তক মুন্ডন করে গৃহত্যাগ করেন। তাঁকে স্মরণ করে এই কাজটা করেছি। এখন স্যার বলেন আপনি কেমন আছেন ?

ওসি সাহেব বিরসগলায় বললেন, ভাল আছি।

'আমাকে কেন আনিয়েছেন জানতে পারি কি স্যার ?'

'হ্যাঁ জানতে পারেন। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করব ?'

'মুসলেম মিয়া সম্পর্কে ?'

'কেন মুসলেম মিয়া ?'

'খবরের কাগজে যার নিউজ ছাপা হয়েছে। নাঙ্গু বাবা।'

ওসি সাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন, মুসলেম মিয়াকে চেনেন না-কি ?

'জ্বি চিনি।'

রকিবউদ্দিন সাহেব বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, বলেন কী ?

তার গলার আগ্রহ থেকেই বোঝা যাচ্ছে নাঙ্গু বাবা ইতিমধ্যেই প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। তাকে নিয়ে গল্প গুজব ছড়াচ্ছে। আমি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললাম, সামান্য পরিচয় আছে।

'কোথায় পরিচয় ?'

'আমি রাতে বিরাতে হাঁটি তো। সেখানেই দেখা।'

'লোকটার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা তো প্রচণ্ড।'

'তাই না-কি ?'

'হ্যাঁ প্রচন্ড। অন্তর্ভেদি দৃষ্টি। যখন তাকায় তখন মনে হয়– মনের ভেতর যা আছে সব পড়ে ফেলেছে। তারপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসে। ঠান্ডা টাইপ হাসি। এরকম হাসি আমি কাউকে হাসতে দেখিনি।'

'সে কি এই হাজতেই আছে ?'

'না উনি আছেন ধানমণ্ডি থানায়।'

ওসি সাহেব আমার দিকে আরো খানিকটা ঝুঁকে এসে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন, খুবই স্ট্রেঞ্জ একটা ঘটনা। আপনাকে না বলেও পারছি না। ধানমন্ডি থানায় ওসি সাহেবের এক শালী– মেনস্ট্রেশন টাইমে তার প্রচণ্ড ব্যথা হয়। মাঝে মধ্যে অজ্ঞানও হয়ে যায়। তার ব্যথা উঠেছে ওসি সাহেব কি মনে করে মুসলেম সাহেবকে ঘটনাটা বললেন। শুনেই মুসলেম সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়ের ব্যথা চলে গেল।'

'ও।'

'এই ভাবে ও বললেন কেন ? বিশ্বাস হচ্ছে না। ধানমন্ডি থানার ওসি সাহেব নিজের মুখে ঘটনাটা আমাকে বলেছেন।'

'আমরা কি মুসলেম মিয়াকে নিয়েই কথা বলব ?'

'অবশ্যই না। আসুন যে জন্যে ডেকেছি এটা শেষ করি তারপর আপনাকে নিয়ে মুসলেম সাহেবের কাছে যাব। আপনার সঙ্গে পরিচয় কেমন ?'

'খুবই খারাপ ধরনের পরিচয়। আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। একবার দাঁত-টাত বের করে কামড়াতে এসেছিল।'

'তা হলে থাক। এই ধরনের মানুষ অবশ্যি খুব সামান্যতেই ভায়োলেন্ট হন। এদের ঘাঁটাতে নেই। আচ্ছা এখন আসল কাজে আসি। তার আগে আর এককাপ চা খেয়ে নেবেন।'

'জ্বি না।'

'কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন। মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। অনুমানে কিছু বলবেন না। প্রশ্নের উত্তর যদি জানা না থাকে বলবেন জানি না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'হাদিকে চেনেন?'

'একজনকে চিনি। হাদিউজ্জামান খান। তক্ষকের মত মুখ। লম্বা।'

'তার চেহারার বর্ণনা দিতে তো আপনাকে বলিনি। তাকে চেনেন কি না জানতে চেয়েছি।'

'চিনি।'

'তার সঙ্গে শেষ দেখা কবে হয়েছে?'

'গত পরশু।'

'কী কথা হয়েছে?'

'কোনো কথা হয়নি।'

'তাকে চেনেন অথচ কথা হয়নি কেন?'

'মালিহা খালার বাড়িতে উনি ফ্যান নামাতে গেছেন। কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে কথা হয়নি।'

'ফ্যান কি একা একা নামাচ্ছিল না সঙ্গে কেউ ছিল?'

'একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ছিল।'

'ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর নাম?'

'নাম জানি না। ইলেকট্রিক মিস্ত্রী বা কল সারাই মিস্ত্রী, কিংবা টেলিফোনের মিস্ত্রী– এদের নাম সাধারণত জিজ্ঞেস করা হয় না।'

'যে ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে হাদিউজ্জামানের সঙ্গে দেখেছিলেন তাকে দেখলে চিনতে পারবেন?'

'হ্যাঁ পারব।'

'তা হলে একটু হাজতে আসুন– আইডেনটিফাই করবেন?'

www.Murchona.com
suman_ahm@yahoo.com

'ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ভয়ংকর কিছু কি করেছে ?'

'সে একা করেনি দু'জনে মিলে করেছে। আচমকা খুন একজন করে। কিন্তু ক্যালকুলেটিভ মার্ডারের বেলায় একমপ্লিশ লাগে। খুন করেছে হাদিউজ্জামান, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী সালাম হল তার একমপ্লিশ।'

'খুন কে হয়েছে ?'

'মালিহা বেগম। আপনার খালা হন সম্ভবত।'

আমি অবাক হয়ে রকিবউদ্দিন সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার এক আত্মীয় খুন হয়েছে এই খবরটা ওসি সাহেব আমাকে এখন দিচ্ছেন। খুন-টুনের ব্যাপারগুলি পুলিশের কাছে এতই গুরুত্বহীন ?

ওসি সাহেব বললেন, আপনার খালার খুন হবার খবর আপনি পাননি?

'জ্বি না।'

'কাগজে উঠেছে তো। কাগজ পড়েননি ?'

'খুন খারাবির নিউজগুলি আমি পড়ি না। এখন মনে হচ্ছে পড়া দরকার। আমার খালু, আরেফিন সাহেব উনি কোথায় ?......'

'উনাকেও খুন করার চেষ্টা হয়েছে। উনি হাসপাতালে আছেন। ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন।'

'ও আচ্ছা।'

ওসি সাহেব বললেন, 'চলুন তো আমার সঙ্গে সালামকে আইডেনটিফাই করবেন।'

'হাদি সাহেবও কি হাজতে আছেন ?'

'হ্যাঁ। আছে। তবে জ্ঞান আছে বলে মনে হয় না। যে ডলা খেয়েছে তার খবর হয়ে গেছে।'

হাজতের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জনেই পড়ে আছে। মুখ ফুলে এমন হয়েছে যে অতি পরিচিত জনেরও এদেরকে চেনার কথা না। ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ছেলেটা পড়ে আছে খালি গায়ে। তার বুক হাপরের মত ওঠানামা করছে। আমি আমার জীবনে কারো বুক এ ভাবে ওঠানামা করতে দেখিনি। একেকবার বুক ফুলে উঠছে আর মনে হচ্ছে ছেলেটার হৃদপিন্ড পাঁজর ফুড়ে বের হয়ে আসবে।

ওসি সাহেব বললেন, চিনতে পারছেন ?

আমি বললাম, না।

'হাদিকেও চিনতে পারছেন না ?'

'জ্বি না। যে মার মেরেছেন— মুখ যে ভাবে ফুলেছে আমি কেন পাখি এসেও চিনবে না।'

'পাখি কে ?'

'পাখি তাঁর মেয়ে। বারো তারিখ মেয়েটার জন্মদিন। আমার দাওয়াত আছে। কোনো কাজ না থাকলে সেদিন আপনিও চলুন।'

ওসি সাহেব রাগী গলায় বললেন— আপনার খালা খুন হয়ে গেছেন আর আপনার মাথায় ঘুরছে– জন্মদিনের দাওয়াত ? আপনার ফালতু কথা বলার অভ্যাসটা দূর করুন। থানায় এসে একটা বাড়তি কথা বলবেন না।

'জ্বি আচ্ছা। আমি কি হাদি সাহেবের সঙ্গে দু'টা কথা বলব ?'

'বলুন।'

আমি অনেকক্ষণ হাদি সাহেব, হাদি সাহেব বলে ডাকলাম। কেউ জবাব দিল না। অজ্ঞান মানুষ প্রশ্নের জবাব দেয় না। তবে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী উঠে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে কী যেন বলল। তার ঠোঁট কেটে দু'ফাক হয়ে গেছে, দাঁত ভেঙেছে। সে হাত তুলে আমাকে সালামও দিল। মনে হয় আমাকেও পুলিশের কেউ ভেবেছে।

আমি ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি নিশ্চিত যে এরাই খুন করেছে ?

ওসি সাহেব বললেন, অবশ্যই। কিছু-কিছু খুনের মিমাংসা অতি দ্রুত হয়ে যায়, আবার কিছু কিছু খুনের মিমাংসাই হয় না। এই ক্ষেত্রে খুনের মিমাংসা দ্রুত হয়ে গেল।

'হাদি সাহেব স্বীকার করেছেন যে খুনটা উনি করেছেন ?'

'সে করে নাই। তবে সালাম করেছে। তাকে রাজসাক্ষি করে দেব।'

ওসি সাহেব সালামের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি রে তুই খুন করেছিস?

সালাম হ্যাঁ-সুচক মাথা নাড়ল। তার কাটা ঠোঁটের কোণায় সামান্য হাসিও দেখা গেল। যেন খুন করে সে আনন্দিত।

আমরা হাজত থেকে বের হয়ে এলাম। ওসি সাহেব বললেন, এ্যামেচার মার্ডারার। হাদি আপনার খালার ঢাকার বিষয় সম্পত্তির লোভে খুনটা করেছে। ক্যালকুলেশনস ছিল পুওর। ভজঘট করে ফেলেছে। বড় ক্রাইমের ক্রিমিন্যাল সব সময় ধরা পড়ে যায়। ক্রাইমে সে কিছু-না-কিছু খুঁত রেখে যায়। নিজের কিছু চিহ্ন রাখে। একমাত্র পুলিশই পারে কোনো রকম খুঁত ছাড়া ক্রাইম করতে। কারণ তারা খুঁতগুলি জানে।

'স্যার আপনার কথা শুনে ভাল লাগছে।'

'ভাল লাগার মত কী কথা বললাম। ভাল লাগার মত আমি কিছুই বলিনি। আপনি আপনার স্বভাবমত আমাকে নিয়ে ফান করার চেষ্টা করছেন। দয়া করে করবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা। আমি কি চলে যাব, না থাকব ?'

'তদন্তের স্বার্থে আমার উচিত আপনাকে থানায় আটকে রাখা। কিন্তু আমার উপর নির্দেশ আছে আপনাকে ছেড়ে দেয়ার।'

'নির্দেশটা কে দিয়েছেন ? জুঁই-এর বাবা ?'

'হ্যাঁ স্যারের নির্দেশ।'

'জুঁই-এর এখনো কোনো খবর পাওয়া যায়নি ?'

'আমি জানি না।'

'আমি কি টেলিফোনে একটু খোঁজ নিয়ে দেখব ?'

রকিবউদ্দিন সাহেব কিছুক্ষণ ভাবলেন তারপর টেলিফোন সেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি আমার মোবাইলে টেলিফোন করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই জুঁই-এর বাবার গলা শোনা গেল। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বললেন, হ্যালো হ্যালো। কে বলছেন ?

'স্যার আমি হিমু।'

'ও তুমি।'

'জুঁই-এর কি কোনো খবর পাওয়া গেছে ?'

'না।'

'টেলিফোন করেনি ?'

'না।'

'আধ্যাত্মিক লাইনে চেষ্টা চালালে কেমন হয় স্যার ?'

'তার মানে ?'

'খুবই উচ্চশ্রেণীর এক সাধক ধানমন্ডি থানা হাজতে আছেন। তার নাম মুসলেম মিয়া। তবে এই নামে কেউ তাঁকে ডাকে না। এতে বেয়াদবী হয় এই জন্যেই। কেউ-কেউ তাকে ডাকেন নাঙ্গু বাবা, কারণ তিনি নগ্ন থাকেন। আবার কেউ-কেউ ডাকেন বেলী বাবা। কারণ উনি সব সময় বেলী ফুলের মালা গলায় দিয়ে থাকেন। অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন স্যার– শীত কালে যখন বেলী ফুলের সিজন না, তখনো তাঁর গলায় টাটকা বেলী ফুলের মালা দেখা যায়। বাবার কাছে একবার গিয়ে দেখলে হত।'

'আমি কি করব না করব তা আমি ঠিক করব। তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তুমি কোত্থেকে কথা বলছ?'

'থানা থেকে। আমার এক খালা খুন হয়েছেন। পুলিশ এই জন্যে আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে। তবে ওসি সাহেব বলেছেন, ছেড়ে দেবেন।'

'তুমি আর কিছু বলবে না-কি অর্থহীন বক বক করবে? যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা না-থাকে তাহলে টেলিফোনটা রাখ। আমি এই টেলিফোনের লাইনটা সব সময় খোলা রাখতে চাই।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। ওসি সাহেবের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে পথে নামলাম।

আজ সারাদিনে কোথায়-কোথায় যাব ঠিক করা দরকার। মালিহা খালার বাড়িতে যাব না। মৃত মানুষকে দেখতে যাওয়া অর্থহীন। এখানে দেখাটা হয় একতরফা। একজন দেখে– অন্যজন তাকিয়ে থাকে, দেখে না।

আরেফিন খালু সাহেবকে অবশ্যই দেখতে যাব। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে যারা থাকে তাদের দেখতে বড় ভাল লাগে। এরা তখন অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা বলে। একজনকে পেয়েছিলাম যে বারবারই বিস্মিত হয়ে বলছিল– বেহেশত দেখতে পাইতেছি। আচানক বিষয় বেহেশত দেখতেছি। ও আল্লা একটা বাগান। বাগানটা পানির মধ্যে। কী সুন্দর টলটলা পানি। পানির মধ্যে এইটা কী আচানক বাগান। ঘর বাড়ি আছে– পানির রং বদলাইতেছে– ও আল্লা, বাগানের গাছগুলান হাসে। গাছ মানুষের মত হাসে। গাছগুলা আবার এক জায়গা থাইক্যা আরেক জায়গায় যায়.... এইটা কি পানির মধ্যে পাখি উড়তাছে!!...

হাদি সাহেবের কন্যা পাখির সঙ্গেও দেখা করা দরকার। বেচারীর জন্মদিন যেন ভেস্তে না যায়। সার্কাস পার্টিরও খোঁজ নেয়া দরকার। কারো কাছে যদি হাতির বাচ্চা থাকে তা হলে একদিনের জন্যে ভাড়া করতে চাই। কে জানে একদিনের ভাড়া কত?

আজ আকাশ মেঘমেদুর। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। এক পশলা বৃষ্টি মনে হয় হয়েছে। পিচ ঢালা রাজপথ বৃষ্টির পানিতে ভেজা। রূপার পাতের মত চক চক করছে। রাস্তাগুলিতে নদী-নদী ভাব চলে এসেছে।

৭

আরেফিন খালু সাহেবকে রাখা হয়েছে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে।

তাঁর নাকে মুখে নল। বিছানার পাশে স্যালাইনের বোতল ঝুলছে। মাথায়, হাতে ব্যান্ডেজ। একটা চোখ বের হয়ে আছে। সেই চোখের পাতা নামানো। ভাল করে দেখার আগেই পুরুষ টাইপ এক মহিলা নার্স– বের হন, বের হন বলে সবাইকে বের করে দিল। খালু সাহেবের আত্মীয়-স্বজনে হাসপাতাল গিজগিজ করছে। হাসপাতালের ডাক্তার ছাড়াও বাইরের ডাক্তারও এসেছেন। মেডিক্যাল বোর্ড বসেছে। ডাক্তারদের আলাপ আলোচনায় যা জানা গেল তার সারমর্ম হল– রোগী ডীপ কোমায় চলে গেছে। কোনো মিরাকল না-ঘটলে বাঁচবে না। আরেফিন খালুর আত্মীয়-স্বজনদের আলোচনায় জানা গেল ডীপ কোমায় যাবার আগে ডাক্তার, নার্স এবং তাঁর দূর সম্পর্কের এক ভাই-এর কাছে হত্যাকান্ডের বর্ণনা দিয়ে গেছেন। তিনি ঘুমুচ্ছিলেন বসার ঘরের ড্রয়িং রুমে। তাঁর স্ত্রী দরজা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছিলেন শোবার ঘরে। তিনি নিজে অনেক রাত জেগে মদ্যপান করছিলেন বলে শেষ রাতের দিকে তাঁর গাঢ় ঘুম হয়। হঠাৎ ধস্তাধস্তি এবং চিৎকারের শব্দ তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি চমকে উঠে বসেন এবং দেখেন তাঁর বাড়ির কেয়ারটেকারের সঙ্গে তার স্ত্রী ধস্তাধস্তি করছেন। তাঁর স্ত্রীর শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তিনি স্ত্রীকে রক্ষার জন্যে ছুটে যান তারপর কী হয় তা তাঁর মনে নেই।

ইনটেনসিভ কেয়ার ঘরের সামনে একজন পুলিশও দেখলাম ঘোরাঘুরি করছে। চশমা পরা গুরুগম্ভীর একজনকে দেখা গেল। চৈত্রমাসের এই গরমেও তাঁর গায়ে উলের কোট। শুনলাম তিনি ম্যাজিস্ট্রেট। ডেথ বেড স্টেটমেন্ট নিতে এসেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে অত্যন্ত বিরক্ত মনে হল। তিনি তাঁর মতই আরেক গুরু গম্ভীর মানুষকে ভুরু টুরু কুঁচকে হাত পা নেড়ে কী সব বলছেন। আমি কাছে গিয়ে শুনি,ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলছেন– আমি তো সারাদিন এখানে বসে থাকব না। রোগীর যদি জ্ঞান ফেরে আমাকে খবর দিলে আমি চলে আসব। আর ধরেন ইন কেইস যদি জ্ঞান না

ফেরে– ডাক্তারের কাছে রোগী যে কথা বলেছে সেটাকেই স্টেটমেন্ট হিসেবে নেয়া হবে। রোগী ডাক্তারকে কী বলেছে তা একটা কাগজে লিখে সই করে দিতে বলুন।

যাকে এই কথা বলা হল তিনি মহাবিরক্ত হয়ে বললেন, আমি বলব কেন ? আপনি বলুন। এটা আপনার জুরিসডিকশান।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, আমার জুরিসডিকশান হবে কেন ?

'আচ্ছা ফাইন, আপনার জুরিসডিকশান না। আপনি চিৎকার করছেন কেন ? Why you are raising your voice.'

'ভয়েস আমি রেইজ করছি না আপনি করছেন ?'

'আপনি শুধু যে ভয়েস রেইজ করছেন তা না, আপনি মুখ দিয়ে থুথুও ছিটাচ্ছেন।'

দু'জনের কথা কাটাকাটি শুনতে অনেকেই জুটে গেল। সবাই মজা পাচ্ছে। আমিও পাচ্ছি, অপেক্ষা করছি ঝগড়াটা কোথায় থামে সেটা দেখার জন্যে। ঝগড়া থামতে হলে একজনকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে। পরাজয়টা কে স্বীকার করে সেটাই দেখার ইচ্ছা। আমার ধারণা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পরাজয় স্বীকার করবেন। চিৎকার উনিই বেশি করছেন। দম ফুরিয়ে যাবার কথা।

পেছন থেকে আমার পাঞ্জাবি ধরে কে যেন টানল। আমি ফিরে দেখি চন্দ্রা চাচী। অনেক দূরের লতায় পাতায় চাচী। বিবাহ এবং মৃত্যু এই দুই বিশেষ দিনে লতা-পাতা আত্মীয়দের দেখা যায়। সামাজিক মেলামেশা হয়। আন্তরিক আলাপ আলোচনা হয়।

চন্দ্রা চাচী বিস্মিত হয়ে বললেন– তুই এখানে কেন ? আরেফিন সাহেব তোর কে হয় ?

আমি বললাম, আরেফিন সাহেব আমার কেউ হন না তার স্ত্রী আমার খালা হন।

'ও আচ্ছা। আমি জানতামই না। কী রকম দুঃখের ব্যাপার দেখেছিস। দিনে দুপুরে জোড়া খুন।'

'জোড়াখুন বলতে পার না— একজন তো এখনো ঝুলছে।'

চাচী দুঃখিত গলায় বললেন– একটা মানুষ মারা যাচ্ছে আর তুই তার সম্পর্কে এমন ডিসরেসপেক্ট নিয়ে কথা বলছিস। এটা ঠিক না। স্বভাবটা বদলা হিমু।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, জ্বি আচ্ছা বদলাব।

চন্দ্রা চাচী গভীর বিষাদের সঙ্গে বললেন, আমি লক্ষ করছি— মানুষজন কেমন যেন মেকানিক্যাল হয়ে যাচ্ছে। রোবট টাইপ। মানুষের মৃত্যু, রোগ ব্যাধি এই সব কিছুই আর কাউকে স্পর্শ করছে না। ঠিক বলছি না ?

'অবশ্যই ঠিক বলেছেন।'

চন্দ্রা চাচী হাত ব্যাগ থেকে পান বের করে মুখে দিতে দিতে চট করে প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন— আমার ছোট মেয়ে ঝুমুর বিয়ে দিয়েছি। সেনাকুঞ্জে অনুষ্ঠান করেছি— গেস্ট ছিল একহাজার।'

'বল কী ?'

' তাও তো সবাইকে বলতে পারিনি। তোকে অবশ্যই কার্ড পাঠাতাম। তুই কোথায় থাকিস জানি না।'

'বিয়ে ভাল হয়েছে কি না বল। ছেলে কেমন হীরের টুকরা না গোবরের টুকরা ?'

চন্দ্রা চাচী চোখ মুখ শক্ত করে বললেন— ছেলে গোবরের টুকরা হবে কেন ? এই সব কী ধরনের কথা ? ছেলে কেমিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-এ পি. এইচ. ডি. করেছে। আমেরিকায় থাকে। ছেলের আপন চাচা স্টেট মিনিস্টার।

'বলো কি ? মিনিস্টারের ভাতিজা ?'

'ছেলের ফ্যামিলি খুবই পলিটিক্যাল। এবং খানদানী পলিটিক্স করে। এখনকার কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি পলিটিক্স না। ছেলের বড় দাদা বৃটিশ আমলের এম. এল.এ ছিলেন।'

'আশ্চর্য তো।'

চন্দ্রা চাচী আনন্দিত গলায় বললেন, ঝুমুর বিয়েতে মন্ত্রীই এসেছিল চারজন। বাংলাদেশের অনেক ইম্পর্টেন্ট কবি সাহিত্যিকেরা এসেছিলেন। শো বিজনেসের অনেকেই ছিল। ফিল্মের দুই নায়িকা এসেছিল। তারপর টিভির নায়িকারাও ছিল। অটোগ্রাফের জন্যে এমন হুড়াহুড়ি শুরু হল। সব ভিডিও করা আছে। বাসায় আসিস দেখাব।

'আচ্ছা যাব একদিন।'

'আজই চল না। টোটাল চার ঘন্টা ভিডিও ছিল কেটে কুটে দু'ঘন্টা করা হয়েছে। এর মধ্যে আবার বাইরে থেকে মিউজিক পাঞ্চ করা হয়েছে।

বিসমিল্লাহ্ খাঁর সানাই জায়গামত বসানো হয়েছে। মিউজিকটা সামান্য sad হয়েছে তবে তুই দেখে খুবই মজা পাবি।'

'শুনেই আমার মজা লাগছে।'

'বিয়ের দিন ঝুমুকে কী সুন্দর যে লাগছিল। না দেখলে বিশ্বাস করবি না। এর কারণও আছে— ঝুমুরের মেকাপ দেয়ার জন্যে আমি ফিল্ম লাইন থেকে মেকাপম্যান নিয়ে এসেছি। দীপক কুমার শুর, দু'বার মেকাপে জাতীয় পুরস্কার পাওয়া মেকাপম্যান। সে তিনঘন্টা লাগিয়ে মেকাপ দিয়েছে। ফিল্ম লাইনের মেকাপম্যানরা মুখের কাটা ভাঙতে পারে। ঝুমুরের থুতনী সামান্য উঁচু ছিল না ? এটা এমন করেছে.....'

'দাবিয়ে দিয়েছে ?'

'হুঁ। আয়নায় ঝুমু নিজেকে দেখে চিনতে পারেনি।'

'দাঁতের কী করেছে ?'

চন্দ্রা চাচী বিস্মিত হয়ে তাকালেন। আমি বললাম, ঝুমুর সামনে কোদাল সাইজের যে দু'টা দাঁত ছিল তার কী করা হয়েছে ? সেগুলিও কি দাবিয়ে দেয়া হয়েছে ?

চন্দ্রা চাচী থমথমে গলায় বললেন, ঝুমুর কোদাল সাইজ দাঁত ?

আমি হাই চাপতে-চাপতে বললাম, ভুলে গেছ না-কি, ঝুমুকে স্কুলের বন্ধুরা মিকি মাউস বলে ক্ষেপাত। সে বাসায় ফিরে কাঁদত। ঐ দাঁত দু'টার কি হল ? ফিল্ম লাইনে মেকাপ দিয়ে বড় দাঁত ছোট করার ব্যবস্থা-কি কিছু আছে ?

চন্দ্রা চাচী যে ভাবে তাকাচ্ছেন তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে আমার উপর ঝাপিয়ে পড়বেন। তাকে এই সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না। চলে যেতে হবে। যাবার আগে আরেফিন খালু সাহেবকে একটা কথা বলে যাওয়া দরকার। যে ডীপ কোমায় আসে সে আমার কথা শুনতে পাবে এমন আশা করা ঠিক না। তবু চেষ্টা করতে দোষ নেই। ইনটেনসিভ কেয়ারে ঢোকা আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। ঘরে এখন কাউকেই ঢুকতে দিচ্ছে না। উঁকি-ঝুঁকিও দিতে দিচ্ছে না। দরজার সামনে পুলিশ পাহারা বসে গেছে। কোনো একটা কৌশল বের করতে হবে। ইনটেনসিভ কেয়ারের দায়িত্বে যে ডাক্তার আছেন তাকে ধরতে হবে।

ইনটেনসিভ কেয়ারের দায়িত্বে যিনি আছেন তাঁর নাম মালেকা। ডাঃ মালেকা বানু। আমি লক্ষ্য করেছি পুরুষদের নামের শেষে আকার যুক্ত করে

যে সব মহিলাদের নাম রাখা হয় তাদের মধ্যে পুরুষ ভাব প্রবল থাকে। যেমন,

মালেক থেকে মালেকা
রহিম থেকে রহিমা
সিদ্দিক থেকে সিদ্দিকা
জামিল থেকে জামিলা
শামীম থেকে শামীমা

তবে ডাঃ মালেকা বানুকে সেরকম মনে হল না। তার চেহারার মধ্যেই খালা খালা ভাব। আমি দরজা খুলে তাঁর ঘরে ঢুকলাম তিনি চোখ সরু করে তাকালেন না। বা বিরক্তিতে ঠোঁট গোল করলেন না। আমি শান্ত গলায় বললাম– আপনি ডাঃ মালেকা বানু ?

'জ্বি।'

আরেফিন সাহেব কোমায় থাকা অবস্থায় আপনাকে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন তা আপনি এখনো পুলিশের কাছে জমা দেননি কেন ? ডেথ বেড কনফেশন যে কি রকম গুরুত্বপূর্ণ তা-কি আপনি জানেন না। ফর ইওর ইনফরমেশন শুধু এই কনফেশনের কারণে দু'জনের ফাঁসি হয়ে যাবে।

'আপনি কি পুলিশের কেউ ?'

'জ্বি। আমি গোয়েন্দা বিভাগের। এই মামলার পুরো তদন্তের দায়িত্বে আমি আছি।'

'বুঝতে পারছি।'

'না বুঝতে পারছেন না। মামলাটা আপনার কাছে যত সহজ মনে হচ্ছে আসলে তত সহজ না। অনেক জটিলতা আছে।'

'ও।'

'আমার পরিচয়টা আশা করি গোপন থাকবে। এখনে কেউ জানে না আমি কে! পুলিশের লোকজনও জানে না। আশা করি আপনার মাধ্যমেও কেউ জানবে না।

'জ্বি না জানবে না। আপনি চা-কফি কিছু খাবেন ?'

'চা কফি কিছুই খাব না। আপনি ব্যবস্থা করে দেবেন যাতে আমি আরেফিন সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে পারি।'

ডাঃ মালেকা বানু বিস্মিত হয়ে বললেন, ওনার সঙ্গে কী ভাবে কথা বলবেন ? উনি ডীপ কোমায় আছেন।

'ডীপ কোমায় থাকা অবস্থাতেও চেতনার একটি অংশ কাজ করে। আমি সেই অংশটার সঙ্গে কথা বলব। হয়ত লাভ কিছু হবে না। তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই।'

'আপনি যখন কথা বলবেন তখন কি আমি পাশে থাকতে পারি ?'

'অবশ্যই পারেন।'

ডাঃ মালেকা বানু বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করেন। আমি ব্যবস্থা করছি। এই ফাঁকে একটু চা খান। প্লীজ।

'জ্বি না চা খাব না।'

'আপনার নামটা জানতে পারি ?'

'নকল নাম জানতে পারেন। আসলটা আপনাকে বলতে পারছি না। একেকটা মামলার সময় আমরা একেকটা নতুন নাম নেই। এই মামলায় আমি যে নাম নিয়েছি সেই নামটা কি বলব ?'

'থাক বলতে হবে না। আপনাকে দেখে পুলিশের লোক বলে মনেই হয় না।'

'গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের দেখেই যদি কেউ বুঝে ফেলে সে পুলিশের লোক তা হলে সমস্যা না ?'

'জ্বি সমস্যা তো বটেই।'

আরেফিন খালু সাহেবের পাশে বসার জন্যে আমাকে একটা চেয়ার দেয়া হয়েছে। আমার পাশে ডাঃ মালেকা কৌতূহল এবং আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘরটা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। ঘরে বাইরের কোনো আলো আসছে না, টিউব লাইট জ্বলছে। মনে হচ্ছে টিউব লাইট থেকেও ঠাণ্ডা আলো আসছে। ঘরে মৃত্যুর গন্ধ। আরেফিন খালুর বিছানার নীচে মৃত্যু থাবা গেড়ে বসে আছে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

আমি সহজ গলায় ডাকলাম— খালু সাহেব। খালুসাহেব। আমি হিমু।

ডাঃ মালেকা বানু চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখছেন। গোয়েন্দা বিভাগের লোক অপরিচিত একজনকে খালু সাহেব ডাকছে— বিস্মিত হবার মতই ব্যাপার। আমি তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললাম—

'খালু সাহেব আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। মালিহা খালার মৃত্যু কি ভাবে হয়েছে আপনি জানেন। আপনাকে ডীপ কোমা থেকে বের হয়ে এসে এই ঘটনা বলতে হবে। যদি না বলেই আপনি মারা যান– তা হলে দু'টি নিরপরাধ লোক ফাঁসিতে ঝুলবে।'

ডাঃ মালিকা বানু আমার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন— excuse me.....

আমি আবারো তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে খালুকে বললাম, খালু সাহেব আমার ধারণা আপনি কোনো-না-কোনো ভাবে আমার কথা শুনছেন। আপনাকে মৃত্যুর আগে অবশ্যই প্রকৃত ঘটনা বলে যেতে হবে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ডাঃ মালেকা বানু কড়া চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। আমি তাঁকে মিষ্টি গলায় বললাম, আপনার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেছি। আমি পুলিশের কেউ না। উনি আমার খালু হন। আপনি আমার নাম জানতে চেয়েছিলেন— আমার নাম হিমু।

ভদ্রমহিলা তাকিয়ে আছেন। আমি মধুর ভঙ্গিতে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। হাদি সাহেবের বাড়িতে যেতে হবে। তার ছোট মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

মেয়েটা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে খাতা। খাতায় কুমীরের ছবি আঁকা। কুমীর রঙ করা হচ্ছিল। আংগুলে ক্রেয়নের সবুজ রঙ লেগে আছে।

মেয়েটির দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে কঠিন ভঙ্গি আছে। তবে দু'টা চোখই টলটলা। চোখের দিকে তাকালেই মনে হবে এক্ষুনি পানিতে চোখ ভর্তি হয়ে যাবে।

আমি বললাম, কেমন আছ পাখি ?

মেয়েটা জবাব দিল না। অপরিচিত মানুষের আন্তরিক প্রশ্নে খটকা লাগে। মেয়েটার মনে খটকা লাগছে। সে আমাকে লক্ষ করছে। বোঝার চেষ্টা করছে। আমি বললাম, তোমার কুমীরের ছবির রঙটা ঠিক হয়নি। কুমীর কখনো সবুজ হয় না।

'এই কুমীরটা যে পানিতে ছিল সেই পানি শ্যাওলায় ভর্তি। এই জন্যেই কুমীরটা সবুজ।'

'কুমীর থাকে নদী-নালায়। নদী নালায় শ্যাওলা হয় না। আমার ধারণা তোমার কাছে শুধু সবুজ রঙ আছে বলে কুমীর সবুজ রঙ করেছ।'

'আমার কাছে সবুজ আর লাল রঙ আছে।'

'তা হলে সবুজ রঙের কুমীর বানিয়ে ভালই করেছ। লাল রঙের কুমীরের চেয়ে সবুজ রঙের কুমীর ভাল।'

পাখির কাঠিন্য হঠাৎ কমে গেল। সে শান্ত গলায় বলল, আপনাকে আমি চিনেছি। আপনার সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়েছে। আপনার নাম হিমু। আপনি তো বাবার সঙ্গে কথা বলতে এসছেন, বাবা বাসায় নেই।

'আমি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে আসিনি। তোমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি। আজ স্কুলে যাওনি ?'

'না।'

'স্কুলে নিয়ে যাওয়ার কেউ ছিল না এই জন্যে ?'

'হুঁ।'

'বাসায় তুমি ছাড়া আর কে আছে ?'

পাখি জবাব দিল না। আমি লক্ষ করলাম তার চোখে পানি জমতে শুরু করেছে। সে হাতের তালুতে চোখ মুছল। লাভ হল না, সঙ্গে-সঙ্গে চোখ আবার পানিতে ভর্তি হয়ে গেল। আমি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হলাম মেয়েটা বাড়িতে একা আছে। গত রাতেও হয়তোবা একাই ছিল।

'ঢাকায় তোমাদের আত্মীয়-স্বজন আছেন না ?'

'আছেন।'

'তুমি তাদের ঠিকানা জান না ?'

মেয়েটা না-সূচক মাথা নাড়ল। সে তার চোখের পানি নিয়ন্ত্রনে নিয়ে নিয়েছে। এখন তার চোখ শুকনা। ছলছলে ভাবও নেই।

'তোমার বাবা কোথায় তুমি জান ?'

'জানি।'

'সকালে নাশতা খেয়েছ ?'

'না।'

'না কেন ? ঘরে খাবার কিছু ছিল না ?'

'না।'

'আমার ধারণা আছে। তুমি ভাল করে খুঁজে দেখনি। আটা থাকার কথা। আটা দিয়ে রুটি বানানো যায়। শব্জি থাকার কথা। শব্জি ভাজি, রুটি। ডিম যদি থাকে তা হলে ডিমের মামলেট। তুমি রান্না করতে পার না ?'

'চায়ের পানি গরম করতে পারি।'

'আসলটাই তো পার। রুটি বেলাও খুব সহজ। আটা দিয়ে একটা গোল্লার মত বানিয়ে বেলতে হয়.....'

পাখির চোখের কোণায় সামান্য আনন্দ যেন ঝলসে উঠল। চোখ চিকচিক করে উঠল। আমি বললাম– চলো রান্নাঘরে গিয়ে দেখি কী আছে, কী নেই। আমিও সকালে নাশতা করিনি। আজকের নাশতাটা তুমি বানাও। দু'জনে মিলে নাশতা করি। নাশতা বানাতে পারবে না?

'আপনি দেখিয়ে দিলে পারব।'

'আমি দেখিয়ে দেব কী ভাবে! আমি কিছু জানি না-কি? যাই হোক দেখি দু'জনে মিলে চিন্তা-ভাবনা করে একটা কিছু করতে হবে। আগে চলো রান্নাঘর ইন্সপেকশন করে দেখি।'

রান্নাঘরে ময়দা পাওয়া গেল, আলু পাওয়া গেল; একটা ডিম পাওয়া গেল। আমি পাখিকে নিয়ে মহা উৎসাহে রান্না-বান্নায় লেগে গেলাম। রান্না করতে-করতে জানা গেল পাখি কাল রাতে একা ছিল। ঘরে পাউরুটি এবং কলা ছিল। পাউরুটি কলা খেয়েছে। বাবা ফিরে আসবেন এই ভেবে অনেকরাত পর্যন্ত জেগে ছিল। তার স্কুলের অনেক হোমওয়ার্ক ছিল সব করে ফেলেছে।

'ভয় লাগেনি?'

'বাথরুমে কে যেন হাঁটাহাটি করছিল তখন একটু ভয় লেগেছে।'

আমি ভীত গলায় বললাম, বাথরুমে কে হাঁটাহাটি করছিল, ভূত?

পাখি বিরক্ত হয়ে বলল, আপনি কি যে বাচ্চাদের মত কথা বলেন। ভূত বলে পৃথিবীতে কিছু আছে না-কি?

'নেই?'

'অবশ্যই না। ভূত, রাক্ষস, খোক্কস সব বানানো।'

আমি বললাম, ভূত-প্রেতের গল্প এখন থাকুক। আমার এদের কথা শুনলেই গা ছমছম করে।

পাখি বিস্মিত হয়ে বলল, আপনি এত ভীতু কেন?

আমি হাই তুলতে-তুলতে বললাম, আমার অনেক বুদ্ধি তো, এই জন্যে ভীতু। বুদ্ধিমানরা ভীতু হয়। যার যত বুদ্ধি সে তত ভীতু।

'আপনার কথা ঠিক না। আমারও অনেক বুদ্ধি কিন্তু আমি ভীতু না।'

'তা অবশ্যি ঠিক।'

'আর আপনি যে নিজেই নিজেকে বুদ্ধিমান বলছেন, এটাও ঠিক না। এতে অহংকার করা হয়। কেউ অহংকার করলে আল্লাহ খুব রাগ করেন।'

'আল্লাহ মোটেই রাগ করেন না। আল্লাহ কি তোমার-আমার মত যে চট করে রেগে যাবেন? কেউ অহংকার করলে আল্লাহ খুব মজা পান। মজা পেয়ে বলেন, আরে বোকাটা কী নিয়ে অহংকার করছে!'

'আপনাকে কে বলেছে ?'

'কেউ বলেনি আমার মনে হয়।'

'আল্লাকে নিয়ে এই ধরনের কথা মনে হওয়াও খারাপ। এতে পাপ হয়। আপনি এ ধরনের কথা আর কখনো বলবেন না।'

'আচ্ছা বলব না, আর শোনো তুমি কী রুটি বেলছ ? আঁকাবাঁকা হচ্ছে।'

'আপনি উল্টা-পাল্টা কথা বলছেন তো এই জন্যে মন দিয়ে কাজ করতে পারছি না।'

'আচ্ছা যাও আর কথা বলব না– লাস্ট কথাটা বলে নেই।'

'বলুন।'

'নাশতা শেষ করেই তুমি একটা স্যুটকেসে তোমার বই খাতা, জামা টামা এইসব দরকারি জিনিস গুছিয়ে নেবে। আমরা ঘরে তালা দিয়ে চলে যাব।'

'কোথায় যাব ?'

'আমার এক পরিচিত বাসায় তোমাকে রেখে আসব। এখানে তোমাকে একা ফেলে রেখে যাওয়া যাবে না। যে-বাড়ির বাথরুমে ভূত হাঁটাহাটি করে সেই বাড়িতে তোমাকে একা রেখে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।'

'বাথরুমে ভূত হাঁটাহাটি করে আপনাকে কে বলল ?'

'তুমিই না বললে ?'

পাখি মহা বিরক্ত হয়ে বলল, ভূত হাঁটাহাটি করে এরকম কথা তো আমি বলিনি। আমি শুধু বলেছি– বাথরুমে শব্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কে যেন হাঁটছে।

'কে যেন হাঁটছেটাই ভূত। শহরের বেশির ভাগ ভূতই থাকে বাথরুমে। ওদের একটু পরপরই পানির তৃষ্ণা পায় তো, বাথরুমে থাকাটাই এদের জন্যে সুবিধাজনক। তবে এদের পছন্দ বাথটাবওয়ালা বাড়ি। রাতে বাথটাবে শুয়ে ওরা আরাম করে ঘুমায়।'

পাখি রুটি বেলা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় বলল, আপনি দেখি খুবই বোকা। আপনি এত বোকা কেন ?

আমি হেসে ফেললাম। কারণ, 'আপনি এত বোকা কেন ?' এই প্রশ্নটি আমি আমার এক জীবনে অসংখ্যবার শুনেছি এবং শুধু মেয়েদের কাছ থেকেই শুনেছি। সবচে বেশি শুনেছি রূপার কাছ থেকে। আমার ধারণা আজ আমি যখন পাখিকে নিয়ে রূপার কাছে উপস্থিত হব রূপা কথাবার্তার এক পর্যায়ে অবশ্যই বলবে, হিমু তুমি এত বোকা কেন ?

আমার বাবা তার উপদেশমালায় লিখে গেছেন–

> বাবা হিমালয়,
> তোমাকে বাস করিতে হইবে অনেকের মধ্যে। লক্ষ রাখিও সেই অনেকের কেউই যেন তোমাকে কখনো চালাক বা বুদ্ধিমান মনে না করে। মহাপুরুষরা চালাক হন না, বুদ্ধিমান হন না, আবার তারা বোকাও হন না। পৃথিবীর এই অনিত্য জগতে বুদ্ধির স্থান নাই। বুদ্ধি দ্বারা এই জগত বুঝিবার চেষ্টা করিবে না। চেতনা দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিবে। বুদ্ধি চেতনাকে নষ্ট করে .......

রূপার শরীর ভাল নেই।

এই প্রচণ্ড গরমেও সে চাদর গায়ে দিয়ে বসে আছে। চোখ মুখ ফোলা। নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়ছে। কোলে রাখা টিস্যু বক্স দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। রূপা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কত দিন পরে তোমাকে দেখলাম বলো তো ?

আমি বললাম, প্রায় এক বছর।

রূপা বলল, এক বছর সাত মাস, ন দিন।

'ঘণ্টা মিনিট বাদ দিলে কেন ?'

'ঘণ্টা মিনিটও বলতে পারব। বলতে ইচ্ছা করছে না বলে বলছি না। তোমার সঙ্গের এই মেয়েটি কে ?'

'ওর নাম পাখি। ও তোমার সঙ্গে কিছুদিন থাকবে। বারো তারিখ ওর জন্মদিন। জন্মদিনের দিন আমি ওকে নিয়ে যাব।'

রূপা কিছু বলল না। আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, তোমার কী হয়েছে ?

রূপা বলল, আমার তেমন কিছু হয়নি। তোমার কতদূর কী হয়েছে সেটা বলো। মহাপুরুষ হতে পেরেছ ?

'না।'

'চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ ? এই মেয়েটাকে যে আমার এখানে রেখে যাচ্ছ এটাও কি তোমার মহাপুরুষ-কর্মশালার অংশ ?'

আমি হাসলাম।

রূপা বলল, প্লীজ হাসবে না। তোমার হাসি কোনো দিনই আমার ভাল লাগেনি। যত দিন যাচ্ছে তোমার হাসি ততই বিরক্তিকর হচ্ছে। হায়নার হাসিও তোমার হাসির চেয়ে সুন্দর।

আমি বললাম, রূপা হাসি বন্ধ। আমি চলে যাচ্ছি। তুমি পাখিকে ডেকে ওর সঙ্গে একটা দু'টা কথা বল। নতুন এক বাড়িতে সে থাকতে এসেছে তার এন্ট্রিটা সহজ করে দাও। ও তোমার কঠিন মূর্তি দেখে ঠিক ভরসা পাচ্ছে না।

রূপা হাত ইশারায় পাখিকে ডাকল। পাখি শংকিত পায়ে এগিয়ে এল। রূপা কঠিন গলায়, মাস্টারনীর ভঙ্গিতে বলল, এই মেয়ে তোমার নাম কি?

পাখি ভয়ে ভয়ে বলল, পাখি।

'পাখি তোমার নাম?'

'জ্বি।'

'তুমি কি উড়তে পার?'

'না।'

'না বলে লাভ নেই। যেহেতু তোমার নাম পাখি সেহেতু তোমাকে আকাশে উড়তে হবে। আমি ওয়ান টু থ্রি বলব সঙ্গে সঙ্গে ওড়া শুরু করবে। ওয়ান-টু-থ্রী। কই উড়ছ না কেন?'

পাখি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। রূপা তার বিখ্যাত খিলখিল হাসি শুরু করেছে। আমি এই হাসির নাম দিয়েছিলাম জলতরঙ্গ হাসি। রূপার এই হাসির শব্দটাতেই একটা ম্যাজিক আছে। শব্দ শুনলেই মনে হয়– এটা শুধু হাসি না। হাসি দিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দেয়া। হাসির মাধ্যমে কাছে ডাকা।

আমি যা ভাবছিলাম তাই হল, হাসির শব্দ শুনেই পাখি ছুটে এসে রূপাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। বাচ্চা মেয়েটির বুকে অনেক অশ্রু জমে আছে। অশ্রু বের হওয়া দরকার।

আমি ওদেরকে রেখে আবার পথে নামলাম। আকাশ মেঘলা। রবীন্দ্রনাথের গানের মত মেঘের উপর মেঘ করে আঁধার হয়ে আসছে। এমন দিনে হাঁটতে চমৎকার লাগে।

দশ গজ যাইনি তার আগেই গা ঘেসে একটা গাড়ি থামল। গাড়ির কাঁচ নামিয়ে বোরকা পরা এক মহিলা চাপা গলায় বললেন, তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠুন।

আমি গাড়িতে উঠলাম। বোরকাওয়ালী বললেন, ভাল আছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

'না।'

'বোরকা পরলেও আমার চোখ তো দেখা যাচ্ছে। চোখ দেখেও চিনতে পারছেন না ?'

'পারছি না।'

'আমার গলার স্বরও চিনতে পারছেন না ?'

'না। মেয়েদের গলার স্বরের মধ্যে একমাত্র রূপার গলার স্বর আমি চিনতে পারি। আর কারোর গলা চিনতে পারি না।'

'রূপা কে ? আচ্ছা থাক বলতে হবে না বুঝতে পারছি কে ! এবং আমার ধারণা আপনিও বুঝতে পারছেন আমি কে।'

'তুমি জুঁই। বোরকা পরেছ কেন ? কোনো মওলানা বিয়ে করেছ ?'

জুঁই হেসে ফেলল। শব্দ করে হাসি। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার তার হাসিও রূপার হাসির মত। ঝনঝন করে জলতরঙ্গের মত বাজছে। কাছে ডাকার হাসি।

'খিলখিল করছ কেন ?'

'খিলখিল করছি কারণ আপনাকে দেখে খুব মজা লাগছে। আপনি কি জানেন আমি পাগলের মত আপনাকে খুঁজছি। আপনার একটা মোবাইল টেলিফোন ছিল না ? সেই নাম্বারটাও ভুলে গেছি। আমি আবার নাম্বার মনে রাখতে পারি না। ম্যাট্রিকের রোল নাম্বার কোনো ছেলে মেয়ে ভোলে না। অথচ আমি ভুলে গেছি। আচ্ছা আপনার কি ম্যাট্রিকের রোল নাম্বার মনে আছে ?'

আমি বললাম, তুমি এত আনন্দিত কেন ?

জুঁই হাসতে-হাসতে বলল, আমি আনন্দিত কারণ চোর-পুলিশ খেলায় আমি বাবাকে হারিয়ে দিয়েছি। আপনি তো জানেন না বাবা আমার জীবন অতিষ্ট করে দিয়েছিল। আমার পেছনে সব সময় দু'তিনজন স্পাই। কোথায় যাই-না-যাই সব বাবা জানেন। আমার ঘরে যে টেলিফোন সেখানেও এমন ব্যবস্থা করা ছিল আমি যখন যার সঙ্গে কথা বলছি সব রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে।

'তোমার অবস্থা তো তা হলে মনে হয় খারাপই।'

'হ্যাঁ খারাপ। খুব খারাপ। বাবা যে শুধু আমার পেছনে স্পাই লাগাতেন তা-না, আমি যদি কোনো ছেলের সঙ্গে কয়েকবার কথা বলতাম তা হলে তার পেছনেও স্পাই লাগিয়ে দিতেন।'

'গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করার জন্যে মনে হয় এটা হয়েছে।'

জুঁই সহজ গলায় বলল, আমার মা বাবাকে ছেড়ে পালিয়ে বাবার অতি প্রিয় এক বন্ধুকে বিয়ে করেছিল সেই থেকে হয়েছে। বাবা কাউকে বিশ্বাস

করতে পারে না। ভাল কথা আপনি কি আমাদের কয়েকদিন লুকিয়ে থাকার মত কোনো একটা জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন ?

'আমাদের মানে কি ? বিয়ে করেছ ?'

'হুঁ করেছি।'

'প্রেমের বিয়ে ?'

জুঁই হাসতে-হাসতে বলল, বিয়ে করে ফেলার মত প্রেম ছিল না, বিয়ে করেছি বাবাকে শিক্ষা দেবার জন্যে।

'আমার তো ধারণা ওনার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে।'

'উহুঁ এখনো শিক্ষা হয়নি। আমি বাবার গোয়েন্দাগিরি জন্মের মত শেষ করব। এর মধ্যে আমি আবার মনসুরকে দিয়ে বাবাকে টেলিফোন করিয়েছি। মনসুর গলা মোটা করে বলেছে– থাক এসব বলতে ইচ্ছা করছে না। মনসুর আমার হাজবেন্ডের নাম। সে যেমন সাধারণ তার নামটাও সাধারণ। আমি অবশ্যি তাকে মনসুর ডাকি না। আমি ডাকি– 'মন'। কই আপনি বললেন না– কয়েকদিন থাকার মত একটা জায়গা আপনি দিতে পারেন কি-না। তিন-চার দিন থাকতে পারলেই আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'কী ভাবে ?'

'আমার মা'কে খবর দিয়েছি। উনি থাকেন জার্মানীতে। মা চলে আসছেন।'

'ও।'

'এখন বলুন তিন-চার দিন লুকিয়ে থাকার মত কোনো জায়গা কি আছে ?'

'পাখিদের বাসায় থাকতে পারো !'

'পাখি কে ?'

'পাখি হল হাদিউজ্জামানের মেয়ে।'

'হাদিউজ্জামান কে ?'

'হাদিউজ্জামান হচ্ছে মালিহা বেগমের কেয়ারটেকার।'

'মালিহা বেগম কে ?'

'মালিহা বেগম হল আরেফিন সাহেবের মৃতা স্ত্রী।'

জুঁই ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনার সঙ্গে বক বক করতে ভাল লাগছে না, আপনি নিয়ে যান আমাকে ঐ বাড়িতে।

'আমার যাবার দরকার কী ? তোমাকে চাবি দিয়ে দিচ্ছি। বাড়ির ঠিকানা বলে দিচ্ছি তুমি 'মন' সাহেবকে নিয়ে উঠে পড়।'

'কেউ কিছু বলবে না ?'

'মনে হয় না কেউ কিছু বলবে। আর যদি বলে তুমি বলবে তুমি পাখির চাচাতো বোন। বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে আছ।'

'আমি রাজি।'

'এই নাও চাবি।'

জুঁই বিস্মিত হয়ে বলল, একটা পুরো খালি বাড়ির চাবি আপনি পকেটে নিয়ে কী জন্যে ঘুরছিলেন ?

আমি বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে বললাম, জুঁই শোনো আমরা সবাই বড় একটা পরিকল্পনার অংশ। সেই বড় পরিকল্পনা যিনি করেন আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। কেউ তাঁকে বলে নিয়তি, কেউ বলে প্রকৃতি আবার কেউ কেউ বলে আল্লাহ। আমি পাঞ্জাবির পকেটে খালি বাড়ির চাবি নিয়ে ঘুরব এবং তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে এটা আমার ধারণা বড় পরিকল্পনার ক্ষুদ্র একটা অংশ।

জুঁই শান্তগলায় বলল, আপনার কথা আমার বিশ্বাস করে ফেলতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করছি না। গোয়েন্দা বাবার মেয়ে এত সহজে সব কিছু বিশ্বাস করে না।

আমি বললাম, জুঁই তুমি একটু শব্দ করে হাসো তো ?

জুঁই বলল, কেন ?

'তোমার হাসির শব্দ অসম্ভব সুন্দর।'

জুঁই বলল, আপনার কোনো কথাই আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু এই কথাটা বিশ্বাস করলাম।

৮

মুসলেম মিয়া আবারো পত্রিকার প্রথম পাতায় চলে এসেছে। ছবি সহ নিউজ।

**মুসলেম ছাড়া পেলেন**

> বৃষ্টিতে নগ্ননৃত্য করে যিনি সবার নজর কেড়েছিলেন সেই মুসলেম মিয়া দু'দিন হাজত বাসের পর ছাড়া পেয়েছেন। খবরে জানা গেছে পুলিশের গাড়ি তাকে পুরানো ঢাকার শাহসাহেব গলিতে নামিয়ে দেয়। সেই সময় তাঁর পরনে পুলিশের উপহার দেয়া নতুন পায়জামা পাঞ্জাবি ছিল। অপরাধী হিসেবে ধৃত কারোর প্রতি পুলিশের এই আচরণ নজিরবিহীন। জানা গেছে থানার পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের অনেকেই পা ছুঁয়ে তার দোয়া নিয়েছেন।
>
> মুসলেম মিয়া সম্পর্কে থানা সূত্রে প্রাপ্ত একটি তথ্য হচ্ছে গত দু'দিন মুসলেম মিয়া কোনো খাদ্য গ্রহণ করেননি। এবং এক মুহূর্তের জন্যেও নিদ্রা যাননি। গ্রেফতারের প্রথম দিনে কিছু কথাবার্তা বললেও দ্বিতীয় দিন থেকে তিনি কারো সঙ্গেই কোনো কথা বার্তা বলেন নি। একটি অসমর্থিত খবরে বলা হয় মুসলেম মিয়ার শরীর থেকে ভুড়ভুড় করে বেলী ফুলের গন্ধ আসছে।

মুসলেম মিয়াকে দেখতে যাওয়ার দরকার। সত্যি-সত্যি তার জীবনে কোনো ঘটনা ঘটে গেছে কি-না কে জানে। 'নদীর সঙ্গে মানুষের অনেক মিল আছে' এ ধরনের কথা বলা হয়। নদীর সঙ্গে মানুষের সবচে বড় অমিল হল নদীর পানি হঠাৎ করে উল্টো দিকে বইতে শুরু করতে পারে না। মানুষের গতি পথ হুট করে কোনো রকম পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই পাল্টে যেতে পারে।

ঘোর বৈষয়িক মানুষও এক ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে হঠাৎ বলে বসতে পারেন– এ জীবনে যা উপার্জন করেছি, সৎ উপার্জন এবং অসৎ উপার্জন সবই আমি দান করে দিতে চাই। ব্যবস্থা

করো। কিংবা আশ্রমের কোন মহাপুরুষ ধরনের সাধক মানুষ তাঁর সমগ্রজীবনের পূন্যফল হঠাৎ কোনো এক রাতে আশ্রমের কোনো কাজের মেয়ের পায়ে তুলে দিয়ে বলে– এইটাই আসল জীবন।

মানুষ নদী না। মানুষ অন্য জিনিস।

মুসলেম মিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখলাম। তার সঙ্গে দেখা করার আগে আমাকে জরুরি ভিত্তিতে একটা কাজ করতে হবে, হাদি সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তাঁকে বলতে হবে তাঁর মেয়ে ভাল আছে। এমন এক জায়গায় তাকে রাখা হয়েছে যে তাকে নিয়ে আর কোনো দুঃশ্চিন্তা করতে হবে না। হাদি সাহেব যদি বাকি জীবন জেলেই কাটিয়ে দেন, কিংবা ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়েন তাতেও সমস্যা নেই।

আমাকে দেখে ওসি রকিবউদ্দিন সাহেব কিছুক্ষণ এমন ভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন বিরক্ত হবেন না খুশি হবেন মনস্থির করতে পারছেন না। শেষে বিরক্ত হবার সিদ্ধান্ত নিয়ে বললেন, কী ব্যাপার ?

আমি গদগদ গলায় বললাম, আপনাকে দেখতে এসেছি। সামাজিক মেলামেশা। অনেকদিন দেখি না। মনটা কেমন যেন করছে।

'থানা কি সামাজিক মেলামেশার জায়গা ? কোনো কাজে এসে থাকলে বলুন, আর কাজ না থাকলে চলে যান।'

'সামান্য কাজ ছিল।'

'সেটা কি ?'

'হাদি সাহেবকে বলা যে তার মেয়েটা ভাল আছে।'

'হাদিটা কে ?'

'হাদিউজ্জামান খান। খুনের আসামী।'

'বুঝতে পেরেছি। ও তো নেই।'

'নেই মানে কি ?'

ওসি সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, বসুন বলছি। সামান্য ঘটনা আছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে গলা নামিয়ে বললাম, মেরে ফেলেছেন নাকি ? ডেড বডি কোথায় রেখেছেন ? পানির ট্যাংকে ? রিস্কি হয়ে যাবে তো।

রকিবউদ্দিন সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তবে এই বিরক্তি দীর্ঘস্থায়ী হল না। তিনি সিগারেট ধরালেন এবং সিগারেটের প্যাকেট আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, ব্যাটাকে মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে।

আমি বললাম, কেন ?

'পেটের ভেতর থেকে কথা বের করার জন্যে সামান্য ডলা দেয়া হয়েছিল। ডলাটা বেকায়দায় পড়ায় জ্ঞান হারিয়েছিল। ডলা খেয়ে অভ্যেস নেই তো।'

'সেই জ্ঞান আর ফেরেনি ?'

'নাহ্।'

'জ্ঞান ফিরবে ? না-কি আর ফিরবে না ?'

'আমি কী করে বলব ? ডাক্তার বলতে পারবে।'

'মানুষটা যদি মারা যায় আপনাদের কোনো ঝামেলা হবে না ?'

'ঝামেলা হবে কেন ?'

'আপনাদের ডলা খেয়ে মারা গেল।'

ওসি সাহেব হাই তুলতে-তুলতে বললেন, কোনো ঝামেলা নাই–থানায় এফ আই আর করা আছে– আসামী গভীর রাতে হাজতের শিকে মাথা ঠুকছিল। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে নিবৃত্ত করা হয়।

'ও।'

'চা খান। দিতে বলব ?'

'বলুন।'

চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে বললাম, এই যে ঘটনাগুলি ঘটে– আপনাদের হাতে লোকজন মারা যায় আপনাদের খারাপ লাগে না ?

ওসি সাহেব সিগারেটে লম্বা টান দিতে-দিতে বললেন, সত্যি কথা জানতে চান ?

'হ্যাঁ জানতে চাই।'

'পরনে যখন খাকি পোষাক থাকে তখন খারাপ লাগে না। বাসায় গিয়ে যখন লুংগি গেঞ্জি পরি তখন খারাপ লাগে।'

আমি বললাম, পুলিশের পোষাক পাল্টে লুংগী গেঞ্জি করলে ভাল হত। তাই না ?

রকিবউদ্দিন সাহেব ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, লুংগি গেঞ্জি ? লুংগী পরে আমরা আসামীর পেছনে দৌড়াব ?

'অসুবিধা কী ? মালকোচা মেরে দৌড় দেবেন।'

ওসি সাহেব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এখানে আর বেশি সময় থাকা ঠিক হবে না। চা-টা ভাল হয়েছিল। পুরো কাপ শেষ করলে ভাল হত। শেষ করা ঠিক হবে না। এই সময়ে বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে।

আমি উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললাম– হাদি সাহেব কোথায় আছে বলবেন ? একটু দেখে আসতাম ! পুলিশের ডলা কী জিনিস সে সম্পর্কে ফার্স্ট হ্যান্ড নলেজ নিয়ে আসতাম।

ওসি সাহেব যন্ত্রের মত বললেন, মেডিকেলে। ইনটেনসিভ কেয়ারে।

ভেবেছিলাম আমাকে দেখেই ডঃ মালেকা বানু তেলেবেগুনে টাইপ জ্বলে উঠবেন। কর্কশ গলায় 'গেট আউট' বলে বসবেন এবং বেল টিপে দারোয়ান ডাকাবেন।

সেরকম কিছুই করলেন না। শান্ত গলায় বললেন, হিমু সাহেব আসুন।

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। কারো কাছ থেকে খুব খারাপ ব্যবহার পাব এ জাতীয় মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে যাবার পর হঠাৎ যদি খুব ভাল ব্যবহার পাওয়া যায় তা হলে সব এলোমেলো হয়ে যায়। আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না।

মালিকা বানু বললেন, বসুন। তেতুলের সরবত খাবেন ? আমার বড় মেয়ে কোত্থেকে জানি তেতুলের সরবত বানানো শিখে এসেছে। রোজ ফ্লাস্ক ভর্তি করে তেতুলের সরবত দিয়ে দিচ্ছে। আমি আবার টক খেতে পারি না। মেয়েটাকে সেই কথা বলতেও পারছি না। বেচারী এত শখ করে একটা জিনিস বানাচ্ছে।

আমি বললাম, দিন তেতুলের সরবত।

মালেকা বানু হাসিমুখে গ্লাসে তেতুলের সরবত ঢাললেন। আমার দিকে গ্লাস বাড়িয়ে দিতে-দিতে বললেন, আজও কি আপনি আপনার খালু সাহেবের সঙ্গে গল্প করতে এসেছেন ?

আমি তেতুলের সরবতে চুমুক দিতে-দিতে বললাম, জ্বি না। আজ এসেছি হাদিউজ্জামানের সঙ্গে কথা বলতে।

'থানা থেকে যাকে পাঠিয়েছে সেই হাদিউজ্জামান ?'

'জ্বি। আচ্ছা আপা আপনি বলুন তো হাদিউজ্জামানের বিছানা এবং আমার খালুসাহেব আরেফিন সাহেবের বিছানা কি পাশাপাশি।'

'হ্যাঁ পাশাপাশি।'

আমি স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, তা হলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

মালেকা বানু চোখ সরু করে বললেন, কী রকম ?

আমি বললাম, আমার ধারণা প্রকৃতি বা আল্লাহ বা মহাশক্তি পুরো ব্যাপারটা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে। দু'জনকে ইনটেনসিভ কেয়ারে পাশাপাশি শুইয়ে দিয়েছে। কাজেই এখন বোঝা যাচ্ছে তার পরিকল্পনা মতোই সব কিছু হচ্ছে। আমাদের দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হবার কিছু নেই।

'আপনি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন?'

'হ্যাঁ ছিলাম। আমার ধারণা আমার খালুসাহেবই খুনটা করেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে আহত হয়েছেন। কারণ আমার খালাও খুব সহজ পাত্রী না। অপরাধটা নিজের ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলে দিয়েছেন হাদিউজ্জমানের ঘাড়ে। যাই হোক এখন যেহেতু দু'জন পাশাপাশি আছে প্রকৃতি ব্যাপারটার দ্রুত মিমাংসা করে ফেলবে। দেখা যাবে বারো তারিখে হাদিউজ্জামান সাহেব তার মেয়ের জন্মদিনে উপস্থিত হবেন।

ডঃ মালেকা বানু আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তার দু'চোখে শান্ত কৌতূহল। তার চোখ দু'টি বলে দিচ্ছে আমি নিজ থেকে কিছু জিজ্ঞেস করব না। তবু তুমি যদি কিছু বলো তা হলে খুব আগ্রহ নিয়ে শুনব।

আমার কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না। ক্লান্তি লাগছে। ইচ্ছা করছে পার্কের কোন বেঞ্চিতে শুয়ে থাকতে। আকাশের যে অবস্থা বৃষ্টি নামবেই। পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে বৃষ্টিতে ভেজার মজা অন্য রকম।

আমি বললাম, আপা আপনার টেলিফোনটা কি একটু ব্যবহার করতে পারি?

মালেকা বানু কোনো উত্তর না-দিয়ে টেলিফোন সেট এগিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। টেলিফোনের কথাবার্তা তিনি শুনতে চান না। ভদ্রমহিলার ভদ্রতায় আরেকবার মুগ্ধ হলাম।

টেলিফোন করলাম নিজের মোবাইলের নাম্বারে। টেলিফোন ধরলেন জুঁই-এর বাবা। তিনি হতাশ এবং ক্লান্ত গলায় বললেন– কে?

আমি বললাম, হিমু।

'ও তুমি। জুঁই-এর কোনো খবর পেয়েছ?'

'জ্বি না, আপনি পেয়েছেন?'

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, স্যার আপনি যে আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছিলেন– ওরা কি এখনো আছে?

'না। ওরা হঠাৎ একদিন তোমাকে মিস করেছে। তারপর আর তোমাকে লোকেট করতে পারছে না।'

'স্যার আপনি বোধহয় এক্সপার্ট কাউকে দেননি। শিক্ষানবিশ কাউকে পাঠিয়েছিলেন। এখন আমি আছি ঢাকা মেডিকেল কলেজে। ডাঃ মালেকা বানুর চেম্বার।...'

'হিমু শোনো....অর্থহীন কথা বলে আমার সময় নষ্ট করবে না। আমি আমার মেয়েকে পাচ্ছি না, আই এ্যাম অলমোস্ট এট দি পয়েন্ট অব লুজিং মাই সেনিটি.... আমি দু'রাত ঘুমাইনি। আমার ধারণা মেয়েটা মহা বিপদে পড়েছে। খুব খারাপ একটা টেলিফোন কল পেয়েছি,....'

আমি টেলিফোনে ফোঁপানির মত শব্দ শুনলাম। ভদ্রলোক কাঁদছেন না-কি ? কাঁদাটাই স্বাভাবিক।

আমি বললাম, স্যার আমি জুঁই-এর খবর আপনাকে দিতে পারি।

'কী বললে ? জুঁই-এর খবর দিতে পার ?'

'অবশ্যই পারি।'

'কোথায় আছে সে ?'

'সে কোথায় আছে তা এক শর্তে আপনাকে বলতে পারি।'

'ডোন্ট টক নুইসেন্স। তোমার কাছে পুলিশের লোক যাচ্ছে– তুমি এক্ষুনি এই মুহূর্তে জুঁই-এর কাছে তাদের নিয়ে যাবে। আমিও সঙ্গে আসছি। এখন বলো এখন তুমি কোথায় আছ ?'

'স্যার আপনি মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। চিৎকার চেঁচামেচি করে কোনো লাভ হবে না। আপনার বা আপনার বাহিনীর সাধ্যও নেই আমাকে খুঁজে বের করার। আপনি আমার শর্ত মানলেই মেয়েকে পাবেন।'

'শর্তটা কী ? তোমার কী লাগবে। টাকা ?'

'টাকা না, একটা হাতির বাচ্চা।'

'তার মানে ?'

'একদিনের জন্যে আপনি একটা হাতির বাচ্চা জোগাড় করে দেবেন। এ মাসের বারো তারিখ।'

'হাতীর বাচ্চা আমি কোথায় পাব ?'

'আপনার মত ক্ষমতাবান মানুষের পক্ষে হাতির বাচ্চা জোগাড় করা কোনো ব্যাপারই না। হাতির বাচ্চাটা জোগাড় করুন। বারো তারিখ ভোরবেলা আমি আপনাকে একটা ঠিকানা দেব। ঐ ঠিকানায় হাতির বাচ্চা নিয়ে চলে যাবেন। মেয়েকেও পেয়ে যাবেন।'

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। অতি দ্রুত এখন আমাকে চলে যেতে হবে। জুঁই-এর বাবা এখন থেকে হন্যে হয়ে আমাকে খুঁজবেন, যদি পেয়ে যান তা হলে আর হাতির বাচ্চার ব্যবস্থা হবে না। আমাকে না পেলে তিনি অবশ্যই হাতির বাচ্চা জোগাড় করবেন।

৯

আমি মুসলেম মিয়ার সঙ্গে কয়েকদিন ধরে আছি। দু'জনই পলাতক। মুসলেম পলাতক তার ভক্তদের কাছ থেকে, আমি পলাতক জুঁই-এর বাবার কাছ থেকে। পালিয়ে কেউ কেউ বস্তিবাসী হয়, আমরা দু'জন হয়েছি পাইপবাসী। বিশাল এক স্যুয়ারেজ পাইপে সংসার পেতেছি। পাইপের দু'মাথা চটের পর্দায় ঢাকা। বাইরের জগৎ থেকে চটের পর্দায় আমরা বিচ্ছিন্ন। আমাদের সঙ্গে আরো পাইপ-সংসার আছে। এখানকার ব্যবস্থা আধুনিক ফ্ল্যাটবাড়িগুলির মত। এক ফ্ল্যাটের মানুষ যেমন অন্য ফ্ল্যাটে কী হচ্ছে খবর রাখে না, পাইপ জগতেও এক পাইপের সংসার জানে না অন্য পাইপে কী হচ্ছে।

আমরা মোটামুটি সুখেই আছি। তবে মুসলেম মিয়া খুবই যন্ত্রণা করছে। সারাক্ষণ হা হুতাশ— ভাইজান আপনের কথা শুইন্যা বৃষ্টির পানিতে নেংটা হইয়া নাচলাম। এরপরেই যে কী হইল ভাইজান। এখন মানুষের মনের কথা বুঝি। কে মনে মনে কী ভাবতাছে পরিষ্কার ধরতে পারি। এই যেমন ধরেন আপনে এখন ভাবতেছেন একটা হাতির বাচ্চার কথা। সত্য বলতেছি কি-না বলেন ভাইজান।

আমি বিস্মিত হয়ে বলি, হ্যাঁ সত্য বলছ। হাতির বাচ্চার কথাই ভাবছি।

'তারপর ধরেন বেলী ফুলের গন্ধ। সারা শইল দিয়া ভুরভুর কইরা গন্ধ বাইর হয়। আইজ সকালে একবার গায়ে মাখা সাবান দিয়া গোসল দিছি। দুপুরে গোসল দিছি কাপড় ধোয়া সাবান দিয়া। তারপরেও গন্ধ যায় না। কী করি ভাইজান বলেন।'

'কী করতে চাও?'

'আগের মত হইতে চাই। পীর ফকির হইতে চাই না। পাপ করতে ইচ্ছা করে।'

'ইচ্ছা করলে পাপ করো।'

'আমার যে অবস্থা ভাইজান আর তো মনে হয় পাপ করতে পারব না। পাপই যদি করতে না-পারি পৃথিবীতে বাইচ্যা লাভ কী? দুনিয়ার আসল মজা পাপে। পুণ্যির মজা নাই। কোনো একটা তরিকা আমারে বলেন যেন সব আগের মত হয়। ফুলের গন্ধটা অসহ্য হইছে ভাইজান। এরচে শইল্যে গু মাইখ্যা বইসা থাকা ভাল। এই যে দিন রাইত পাইপের মইধ্যে লুকাইয়া থাকি এইটা কি ভাল?'

'চলো আজ রাতে বের হই। কিছুক্ষণ হাঁটাহাটি করি।'

'আপনে যা বলবেন করব। গু খাইতে বললে, বিসমিল্লাহ্ বলে কাচা গু খাব। খালি আমারে আগের মত বানায়া দেন।'

আমি মুসলেম মিয়াকে নিয়ে বের হলাম।

আজ বারো তারিখ। পাখির জন্মদিন। জন্মদিন হচ্ছে কি-না খোঁজ নেয়া দরকার। জুঁই এর বাবাকে সকালবেলা পাখিদের বাসার ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি। তিনি হাতির বাচ্চা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন কি-না সেটাও জানা দরকার।

পাখিদের বাড়ির কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াতে হল। বাড়ির সামনে বিরাট জটলা। অনেক লোকজন। ব্যাপার কী জিজ্ঞেস করতেই একজন হড়বড় করে বলল, এই বাড়িতে একটা হাতির বাচ্চা নিয়ে একজন গেছে।

আমি বললাম, হাতির বাচ্চা?

'জ্বি হাতির বাচ্চা। দেড় টনী ট্রাকে করে এনেছে।'

'বিষয়টা কী?'

'বিষয়কি জানার জন্যেই তো আমরা দাঁড়ায়ে আছি।'

পাখি মেয়েটির আনন্দ নিজের চোখে দেখতে ইচ্ছা করছে। ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিলাম না। মানুষের গভীর আনন্দ এবং গভীর বিষাদ কাছ থেকে দেখতে নেই।

আমি মুসলেমের দিকে তাকিয়ে বললাম, মুসলেম তোমার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা কী বলে? পাখি মেয়েটির বাবা কি ফিরে এসেছে?

মুসলেম সঙ্গে সঙ্গে বলল, জ্বি ফিরেছেন। উনার শইল খারাপ, তয় ফিরেছেন। পুলিশ উনারে ছাইড়া দিছে।

মুসলেমের কথা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। তার গা দিয়ে বেলী ফুলের গন্ধ ছড়াচ্ছে। তীব্র ভাবেই ছড়াচ্ছে। এই গন্ধের উৎস অনেক গভীরে। সাবান পানির ধোয়ায় এই গন্ধ যাবে না। আমি মুসলেম মিয়াকে নিয়ে হাঁটছি। মুসলেমের চোখে পানি।

সে বিড়বিড় করে বলল, ভাইজান আপনের পায়ে ধরি আমারে বদলায়া দেন। ফুলের গন্ধে আমি পিসাব করি। আপনে আমারে আগের মুসলেম বানায়া দেন।

হায়রে সেই ক্ষমতা যদি আমার থাকত। সব ক্ষমতা নিয়ে একজন দূরে বসে আছেন। ভুল বললাম, দূরে না, কাছেই বসে আছেন। খুব বেশি কাছে বলেই তাকে দেখা যায় না।

---

**For More Books Visit www.MurchOna.com**
**Murchona Forum : http://www.murchona.com/forum/index.php**